ছোটোদের

পথের পাঁচালী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম শ্রেণির দ্রুতপঠনের জন্য

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
পঞ্চম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক :
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
77/2, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-700 016

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি উচ্চপ্রাথমিক স্তরে ২০১৪ সালের নতুন শিক্ষাবর্ষে বলবৎ করতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। সেই সূত্রে অষ্টম শ্রেণির বাংলা বইয়ের সহায়ক পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে গৃহীত হয়েছে একটি গোটা কিশোর-উপন্যাস, 'ছোটোদের পথের পাঁচালী'। প্রখ্যাত লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসে রয়েছে চিত্তাকর্ষক কল্পনা ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের চমকপ্রদ সম্ভার। মূল 'পথের পাঁচালী' বইটিকে বিশেষজ্ঞ কমিটি সম্পাদনা করে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন। আশা করা যায়, দ্রুতপঠন বই হিসেবে ' ছোটোদের পথের পাঁচালী' শিক্ষার্থীদের সমাদর পাবে। বইটিকে রঙে-রেখায় অসামান্য অবয়ব দিয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পী দেবব্রত ঘোষ। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, একটি গোটা বই পড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পঠ ন-সামর্থ্য যেমন বাড়বে, অন্যদিকে সক্রিয়তা-নির্ভর অনুশীলনীর মাধ্যমে তাদের ভাষা-সাহিত্যবোধও উন্নত হবে।

এই বইটিও পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধি-র জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

১

মাঘ মাসের শেষ, শীত বেশ আছে। দুই পাশে ঝোপে-ঝোপে ঘেরা সরু মাটির পথ বাহিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোক সরস্বতীপূজার বৈকালে গ্রামের বাহিরের মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখিতে যাইতেছিল।

দলের একজন বলিল, ওহে হরি, ভুষণো গোয়ালার দরুন কলাবাগানটা তোমরা কি ফের জমা দিয়েচো নাকি?

হরিহর সায়সূচক কিছু বলিতে গিয়া পিছন ফিরিয়া বলিল, ছেলেটা আবার কোথায় গেল? ও খোকা, খোকা-আ-আ—

পথের বাঁকের আড়াল হইতে একটি ছয়-সাত বছরের ফুটফুটে সুন্দর, ছিপছিপে চেহারার ছেলে ছুটিয়া আসিয়া দলের নাগাল ধরিল। হরিহর বলিল — আবার পিছিয়ে পড়লে এরই মধ্যে? নাও এগিয়ে চলো —

ছেলেটা বলিল — বনের মধ্যে কী গেল বাবা? বড়ো বড়ো কান?

হরিহর প্রশ্নের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়া নবীন পালিতের সঙ্গে মৎস্য-শিকারের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে পুনরায় আগ্রহের সুরে বলিল — কী দৌড়ে গেল বাবা বনের মধ্যে? বড়ো বড়ো কান?

হরিহর বলিল — কী জানি বাবা, তোমার কথার উত্তর দিতে আমি আর পারিনে! সেই বেরিয়ে অবধি শুরু করেচো এটা কী, ওটা কী, — কী গেল বনের মধ্যে তা কি আমি দেখেচি? নাও এগিয়ে চলো দিকি!

বালক বাবার কথায় আগে আগে চলিল।

হঠাৎ হরিহরের ছেলেটি মহা-উৎসাহে পাশের এক উলুখড়ের ঝোপের দিকে আঙুল তুলিয়া চিৎকার

করিতে করিতে ছুটিয়া গেল — ওই যাচ্ছে বাবা, দ্যাখো বাবা, ওই গেল বাবা, বড়ো বড়ো কান, ওই —

তাহার বাবা পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল, — উঁহু উঁহু উঁহু — কাঁটা কাঁটা কাঁটা — পরে তাড়াতাড়ি আসিয়া খপ করিয়া ছেলের হাতখানি ধরিয়া বলিল, — আঃ বড্ড বিরক্ত কল্লে দেখচি তুমি, একশোবার বারণ কচ্ছি তা তুমি কিছুতেই শুনবে না, ওই জন্যেই তো আনতে চাচ্ছিলাম না।

বালক উৎসাহে ও আগ্রহে উজ্জ্বল মুখ উঁচু করিয়া বাবার মুখের দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল— কী বাবা?

হরিহর বলিল — কী তা কী আমি দেখেচি! — শুয়োর-টুয়োর হবে — নাও চলো, ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো —

— শুয়োর না বাবা, ছোট্ট যে! পরে সে নীচু হইয়া দৃষ্ট বস্তুর মাটি হইতে উচ্চতা দেখাইতে গেল।

চলো চলো — হ্যাঁ — আমি বুঝতে পেরেচি, আর দেখাতে হবে না — চলো দিকি!...

নবীন পালিত বলিল — ও হলো খরগোশ, খোকা খরগোশ। এখানে খড়ের ঝোপে খরগোশ থাকে, তাই।

বালক বর্ণ পরিচয়ে 'খ'-এ খরগোশের ছবি দেখিয়াছে কিন্তু তাহা যে জীবন্ত অবস্থায় এরকম লাফাইয়া পালায় বা তাহা আবার সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, একথা সে কখনও ভাবে নাই।

খরগোশ! — জীবন্ত! একেবারে তোমার সামনে লাফাইয়া পালায়; — ছবি না, কাচের পুতুল না — একেবারে কানখাড়া সত্যিকারের খরগোশ। এইরকম ভাঁটগাছ বৈঁচিগাছের ঝোপে! — জল-মাটির তৈরি নশ্বর পৃথিবীতে এ ঘটনা কী করিয়া সম্ভব হইল, বালক তাহা কোনোমতেই ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারিতেছিল না।

সকলে বনে ঘেরা সরু পথ ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল। নদীর ধারে বাবলা ও জিওল গাছের আড়ালে একটি বড়ো ইটের পাঁজার মতো জিনিস নজরে পড়ে, ওটা পুরানো কালের নীলকুঠির জ্বালঘরের ভগ্নাবশেষ।

মাঠের ঝোপঝাপগুলা উলুখড়, বনকলমি, সোঁদাল ও কুলগাছে ভরা। কলমিলতা সারা ঝোপগুলার মাথা বড়ো বড়ো সবুজ পাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে — ভিতরে স্নিগ্ধ ছায়া, ছোটো গোয়ালে, নাটাকাঁটা ও নীল বন-অপরাজিতা ফুল সূর্যের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে, পড়ন্ত বেলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা, পাখির ডাক, চারিধারে প্রকৃতির মুক্ত হাতে ছড়ানো ঐশ্বর্য, রাজার মতো ভাণ্ডার বিলাইয়া দান, কোথাও এতটুকু দারিদ্র্যের আশ্রয় খুঁজিবার চেষ্টা নাই, মধ্যবিত্তের কার্পণ্য নাই। বেলাশেষের ইন্দ্রজালে মাঠ, নদী, বন মায়াময়।

মাঠের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে নবীন পালিত মহাশয় একবার এই মাঠের উত্তর অংশের জমিতে শাঁকআলুর চাষ করিয়া কীরূপ লাভবান হইয়াছিলেন, সে গল্প করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাহা হইতে বর্তমান কালের দুর্মূল্যতা, আষাঢ়ুর বাজারে কুণ্ডুদের গোলদারি দোকান পুড়িয়া যাইবার কথা, গ্রামের দীনু গাঙ্গুলির মেয়ের বিবাহের তারিখ কবে পড়িয়াছে প্রভৃতি বিবিধ আবশ্যকীয় সংবাদের আদান-প্রদান হইতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে বলিল — নীলকণ্ঠ পাখি কই বাবা?

— এই দেখো এখন, বাবলাগাছে এখুনি এসে বসবে —

বালক মুখ উঁচু করিয়া নিকটবর্তী সমুদয় বাবলাগাছের মাথার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মাঠের ইতস্তত নীচু নীচু কুলগাছে অনেক কুল পাকিয়া আছে, বালক অবাক হইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। কয়েকবার কুল পাড়িতে গিয়া বাবার বকুনিতে তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইল। এত ছোটো গাছে কুল হয়? তাহাদের পাড়ায় যে কুলের গাছ আছে, তাহা খুব উঁচু বলিয়া ইচ্ছা থাকিলেও সে সুবিধা করিতে পারে না। ভারী আঁকুশিটা দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াও তুলিতে পারে না, কুপথ্যের জিনিস লুকাইয়া খাওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে — এ সে টের পায়।

হরিহর বলিল — কুঠি কুঠি বলছিলে, ওই দ্যাখো খোকা, সাহেবদের কুঠি, দেখেচো?

নদীর ধারের অনেকটা জুড়িয়া সেকালের কুঠিটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মতো পড়িয়াছিল।

বালক অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহার ছয় বৎসরের জীবনে এই প্রথম সে বাড়ি হইতে এত দূরে আসিয়াছে। এতদিন নেড়াদের বাড়ি, নিজেদের বাড়ির সামনেটা, বড়োজোর রানুদিদিদের বাড়ি, ইহাই ছিল তাহার জগতের সীমা। কেবল এক একদিন তাহাদের পাড়ার ঘাটে মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে আসিয়া সে স্নানের ঘাট হইতে আবছায়া দেখিতে পাওয়া কুঠির ভাঙা জ্বালঘরটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত — আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত, মা, ওদিকে কি সেই কুঠি?

সে তাহার বাবার মুখে, দিদির মুখে, আরও পাড়ার কত লোকের মুখে কুঠির মাঠের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার প্রথম সেখানে আসা! ওই মাঠের পরে ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য? শ্যাম-লঙ্কার দেশে, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গাছের নীচে নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায়? ও-ধারে আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটিই এই। ইহার পর হইতে অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ শুরু হইয়াছে।

বাড়ি ফিরিবার পথে সে পথের ধারের একটা নীচু ঝোপ হইতে একটা উজ্জ্বল রং-এর ফলের থোলো ছিঁড়িতে হাত বাড়াইল। তাহার বাবা বলিল, হাঁ হাঁ, হাত দিয়ো না হাত দিয়ো না, — আলকুশি আলকুশি। কী যে তুমি করো বাবা! বড্ড জ্বালালে দেখচি। আর কোনোদিন কোথাও নিয়ে বেরুচ্চিনে বলে দিলাম — এক্ষুনি হাত চুলকে ফোসকা হবে — পথের মাঝখান দিয়ে এত করে বলচি হাঁটতে — তা তুমি কিছুতেই শুনবে না। —

— হাত চুলকুবে, কেন বাবা ?

— হাত চুলকুবে, বিষ বিষ — আলকুশিতে কি হাত দেয় বাবা? শুঁয়ো ফুটে রি রি করে জ্বলবে এক্ষুনি — তখন তুমি চিৎকার শুরু করবে।

গ্রামের মধ্যে দিয়া হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া খিড়কির দোর দিয়া বাড়ি ঢুকিল। সর্বজয়া খিড়কির দোর খোলার শব্দে বাহিরে আসিয়া বলিল — এই এত রাত হলো! তা ওকে নিয়ে গিয়েচ, না একটা দোলাই গায়ে না কিছু!

হরিহর বলিল,— আঃ, নিয়ে গিয়ে যা বিরক্ত! এদিকে যায়, ওদিকে যায়, সামলে রাখতে পারিনে — আলকুশির ফল ধরে টানতে যায়। পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল, কুঠির মাঠ দেখব, কুঠির মাঠ দেখব— কেমন, হলো তো কুঠির মাঠ দেখা?

২

সকালবেলা। আটটা কী নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে, তাহার একটা ছোটো টিনের বাক্স আছে, সেটার ডালা ভাঙা। বাক্সের সমুদয় সম্পত্তি সে উপুড় করিয়া মেঝেতে ঢালিয়াছে। একটা রং-ওঠা কাঠের ঘোড়া, চার পয়সা দামের, একটা টোল-খাওয়া টিনের ভেঁপু-বাঁশি, গোটাকতক কড়ি। এগুলি সে মায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মীপূজার কড়ির চুপড়ি হইতে খুলিয়া লইয়াছিল ও পাছে কেহ টের পায় এই ভয়ে সর্বদা লুকাইয়া রাখে, একটা দু-পয়সা দামের পিস্তল, কতকগুলো শুকনো নাটা ফল — দেখিতে ভালো বলিয়া তাহার দিদি কোথা হইতে অনেকগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল, কিছু তাহাকে দিয়াছে, কিছু সে নিজের পুতুলের বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে। খানকতক খাপরার কুচি। গঙ্গা-যমুনা খেলিতে এই খাপরাগুলির লক্ষ্য অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায় সে এগুলি সযত্নে বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে, এগুলি তাহার মহামূল্যবান সম্পত্তি। এতগুলি জিনিসের মধ্যে সবে সে টিনের বাঁশিটা কয়েকবার বাজাইয়া সেটির সম্বন্ধে বিগতকৌতূহল হইয়া তাহাকে এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে। কাঠের ঘোড়া নাড়াচাড়া করা হইয়া গিয়াছে। সেটিও এক পাশে পিঁজরাপোলের আসামির ন্যায় পড়িয়া আছে। বর্তমানে সে গঙ্গা-যমুনা খেলিবার খাপরাগুলিকে হাতে লইয়া মনে মনে দাওয়ার উপর গঙ্গা-যমুনার ঘর আঁকা কল্পনা করিয়া চোখ বুজিয়া খাপরা ছুঁড়িয়া দেখিতেছে। তাক ঠিক হইতেছে কিনা!

এমন সময়ে তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল — অপু — ও অপু —। সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্কতামিশ্রিত। মানুষের গলার আওয়াজ পাইয়া অপু কলের পুতুলের মতো লক্ষ্মীর চুপড়ির কড়িগুলি তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল। পরে বলিল — কী রে দিদি?

দুর্গা হাত নাড়িয়া ডাকিল — আয় এদিকে — শোন্ —

দুর্গার বয়স দশ-এগারো বৎসর হইল। গড়ন পাতলা পাতলা, রং অপুর মতো অতটা ফর্সা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ — বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মতো চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর। অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল, — কী রে?

দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা। সেটি সে নীচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আম কাটা। সুর নীচু করিয়া বলিল — মা ঘাট থেকে আসেনি তো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল — উঁহু —

দুর্গা চুপি চুপি বলিল — একটু তেল আর নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুসি জারাবো —

অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল — কোথায় পেলি রে দিদি?

দুর্গা বলিল— পটলিদের বাগানে সিঁদুরকোটোর তলায় পড়ে ছিল—আন্ দিকি একটু নুন আর তেল।

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল — তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে? আমার কাপড় যে বাসি?

তুই যা না শিগগির করে, মা আসতে এখন ঢের দেরি — ক্ষার কাচতে গিয়েচে — শিগ্‌গির যা —

অপু বলিল — নারকেলের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আসব — তুই খিড়কিদোরে গিয়ে দ্যাখ মা আসছে কিনা।

দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল, তেল-টেল যেন মেঝেতে ঢালিসনে, সাবধানে নিবি, নইলে মা টের পাবে — তুই তো একটা হাবা ছেলে —

অপু বাড়ির মধ্যে হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল, — বলিল, নে হাত পাত।

— তুই অতগুলো খাবি দিদি?

— অতগুলো বুঝি হলো? এই তো — ভারি বেশি — যা, আচ্ছা নে আর দু-খানা — বাঃ দেখতে বেশ হয়েছে রে, একটা লঙ্কা আনতে পারিস? আর একখানা দেবো তাহলে —

— লঙ্কা কী করে পাড়ব দিদি? মা যে তক্তার ওপর রেখে দ্যায়, আমি যে নাগাল পাইনে?

তবে থাক্‌গে যাক — আবার ওবেলা আন্‌ব এখন — পট্‌লিদের ডোবার ধারের আমগাছটায় গুটি যা ধরেচে — দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে —

দুর্গাদের বাড়ির চারিদিকেই জঙ্গল। হরিহর রায়ের জ্ঞাতি-ভ্রাতা নীলমণি রায় সম্প্রতি গত বৎসর মারা গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া নিজ পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। কাজেই পাশের এ ভিটাও জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। নিকটে আর কোনো লোকের বাড়ি নাই। পাঁচ মিনিটের পথ গেলে তবে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি।

হরিহরের বাড়িটাও অনেক দিন হইয়া গেল মেরামত হয় নাই, সামনের দিকের রোয়াক ভাঙা, ফাটলে বন-বিছুটির ও কালমেঘ গাছের বন গজাইয়াছে — ঘরের দোর-জানালার কপাট সব ভাঙা, নারিকেলের দড়ি দিয়া গরাদের সঙ্গে বাঁধা আছে।

খিড়কি দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শুনা গেল — দুগ্‌গা, ও দুগ্‌গা —

দুর্গা বলিল — মা ডাকছে, যা দেখে আয় — ওখানা খেয়ে যা — মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে ফ্যাল্‌ —

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভরতি। সে তাড়াতাড়ি জারানো আমের চাক্‌লাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠালগাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনতাসূচক হাসি হাসিল। দুর্গা খালি মালাটা এক টান মারিয়া ভেরেন্ডা-কচার বেড়া পার করিয়া নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল — মুখটা মুছে ফ্যাল্‌ না বাঁদর — নুন লেগে রয়েছে যে ...

পরে দুর্গা নিরীহমুখে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বলিল — কী মা?

—কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাব? সকাল থেকে ক্ষার কেচে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল, একটুখানি যদি কোনো দিক থেকে আসান আছে তোমাদের দিয়ে—অত বড়ো মেয়ে, সংসারের কুটোগাছটা ভেঙে দু-খানা করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো টোক্‌লা সেধে বেড়াচ্ছেন—সে বাঁদর কোথায়?

অপু আসিয়া বলিল, মা খিদে পেয়েছে।

রোসো রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু ... একটুখানি হাঁপ জিরোতে দাও! তোমাদের রাতদিন খিদে আর রাতদিন ফাইফরমাজ। ও দুগ্‌গা, দ্যাখ্‌ তো বাছুরটা হাঁক পাড়ছে কেন?

খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল — আর এট্টু আটা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সংকুচিত সুরে বলিল — চালভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে খাইতে বলিল — উঃ, চিবোনো যায় না। আম খেয়ে দাঁত টকে —

দুর্গার ভ্রূকুটিমিশ্রিত চোখ-টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল, — আম কোথায় পেলি?

সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল — তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল — ওকে জিজ্ঞেস করো না? আমি — এই তো এখন কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে — তুমি যখন ডাকলে তখন তো —

স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল — যা, বাছুরটা ধরগে যা — ডেকে ডেকে সারা হলো — কমলে বাছুর, ও সন্ন, এত বেলা করে এলে কি বাঁচে? একটু সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পজ্জন্ত বাছুর বাঁধা —

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তাহার পিঠে দুম্ করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল — লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল — আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে — আবার কোনো দিন আম দেবো খেয়ো — ছাই দেবো — এই ওবেলাই পটলিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জারাবো, এত বড়ো বড়ো গুটি হয়েছে, মিষ্টি যেন গুড় — দেবো তোমায়? খেয়ো এখন? হাবা একটা কোথাকার — যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে!

দুপুরের কিছু পরে হরিহর কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিল। সে আজকাল গ্রামের অন্নদা রায়ের বাটীতে গোমস্তার কাজ করে। জিজ্ঞাসা করিল — অপুকে দেখচিনে?

সর্বজয়া বলিল — অপু তো ঘুমুচ্ছে।

— দুগ্‌গা বুঝি —

— সে সেই খেয়ে বেরিয়েচে — সে বাড়ি থাকে কখন? দুটো খাওয়ার সঙ্গে যা সম্পর্ক! আবার সেই খিদে পেলে তবে আসবে — কোথায় কার বাগানে, কার আমতলায় জামতলায় ঘুরছে — এই চত্তির মাসের রোদ্দুরে, ফের দ্যাখো না এই জ্বরে পড়ল বলে — অত বড়ো মেয়ে, বলে বোঝাব কত? কথা শোনে, না কানে নেয়?

এই সময়ে মেয়ে দুর্গা কোথা হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া বাহিরের দুয়ারের আড়াল হইতে সতর্কতার সহিত একবার উঁকি মারিল এবং অপর পক্ষ সম্পূর্ণ সজাগ দেখিয়া ও-ধারে পাঁচিলের পাশ বাহিয়া বাহির বাটীর রোয়াকে উঠিল। উঠানে নামিয়া সে কাঁঠাল তলায় দাঁড়াইয়া কী করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিরুৎসাহভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

পরে হঠাৎ কী ভাবিয়া রুক্ষ চুলগুলি বাতাসে উড়াইতে উড়াইতে মহা খুশির সহিত পুনরায় সোজা বাটীর বাহির হইয়া গেল।

৩

অপুদের বাড়ি হইতে কিছু দূরে একটি খুব বড়ো অশ্বত্থ গাছ ছিল। কেবল তাহার মাথাটা উহাদের দালানের জানালা কি রোয়াক হইতে দেখা যায়। অপু মাঝে মাঝে সেই দিকে চাহিয়া দেখিত। যতবার সে চাহিয়া দেখে, ততবার তাহার যেন অনেক — অনেক — অনেক দূরের কোন দেশের কথা মনে হয় — কোন দেশ, এ তাহার ঠিক ধারণা হইত না — কোথায় যেন কোথাকার দেশ --- মার মুখে ওই সব দেশের রাজপুত্তুরদের কথাই সে শোনে।

অনেক দূরের কথায় তাহার শিশু মনে একটা বিস্ময়মাখানো আনন্দের ভাবের সৃষ্টি করিত। নীল রং-এর আকাশটা অনেক দূর, ঘুড়িটা — কুঠির মাঠটা অনেক দূর, — সে বুঝাইতে পারিত না, বলিতে পারিত না কাহাকেও, কিন্তু এসব কথায় তাহার মন যেন কোথায় উড়িয়া চলিয়া যাইত — এবং সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, অনেক দূরের এই কল্পনা তাহার মনকে অত্যন্ত চাপিয়া তাহাকে যেন কোথায় লইয়া ফেলিয়াছে — ঠিক সেই সময়েই মায়ের জন্য তাহার মন কেমন করিয়া উঠিত, যেখানে সে যাইতেছে সেখানে তাহার মা নাই, অমনি মায়ের কাছে যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া পড়িত। কতবার যে এ রকম হইয়াছে। আকাশের গায়ে অনেক দূরে একটা চিল উড়িয়া যাইতেছে — ক্রমে ছোট্ট — ছোট্ট — ছোট্ট হইয়া নীলুদের তালগাছের উঁচু মাথাটা পিছনে ফেলিয়া দূর আকাশে ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে — চাহিয়া দেখিতে দেখিতে যেমন উড়ন্ত চিলটা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইত, অমনি সে চোখ নামাইয়া লইয়া বাহিরবাটী হইতে একদৌড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া গৃহকার্যরত মাকে জড়াইয়া ধরিত। মা বলিত — দ্যাখো, দ্যাখো, ছেলের কান্ড দ্যাখো — ছাড় — ছাড় — দেখছিস সকড়ি হাত? ... ছাড়ো মানিক আমার, সোনা আমার, তোমার জন্যে এই দ্যাখো চিংড়িমাছ ভাজচি — তুমি যে চিংড়িমাছ

ভালোবাসো? হ্যাঁ, দুষ্টুমি করে না — ছাড়ো।

আহারাদির পর দুপুরবেলা তাহার মা কখনও কখনও জানালার ধারে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছেঁড়া কাশীদাসী মহাভারতখানা সুর করিয়া পড়িত। বাড়ির ধারে নারিকেল গাছটাতে শঙ্খচিল ডাকিত, অপু নিকটে বসিয়া হাতের লেখা ক-খ লিখিতে লিখিতে একমনে মায়ের মুখের মহাভারত পড়া শুনিত।

জানালার বাহিরে বাঁশবনের, দুপুরের রৌদ্র-মাখানো শেওড়া ঘেঁটু বনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মহাভারতের — বিশেষত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যায়। মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কর্ণের চরিত্র বড়ো ভালো লাগে তাহার কাছে। ইহার কারণ কর্ণের উপর তাহার কেমন একটা মমতা হয়। রথের চাকা মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছে — এক হাতে প্রাণপণে সেই চাকা মাটি হইতে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন — সেই নিরস্ত্র, অসহায় বিপন্ন, কর্ণের অনুরোধ মিনতি উপেক্ষা করিয়া অর্জুন তির ছুড়িয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন! মায়ের মুখে এই অংশ শুনিতে শুনিতে দুঃখে অপুর শিশুহৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, চোখের জল বাগ মানিত না — চোখ ছাপাইয়া তাহার নরম তুলতুলে গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িত — সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখে চোখে জল পড়ার যে আনন্দ, তাহা তাহার মনোরাজ্যে নব অনুভূতি সজীবত্ব লইয়া পরিচিত হইতে লাগিল।

বেলা পড়িলে মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে, সে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বত্থ গাছটার দিকে এক একদিন চাহিয়া দেখে — হয়তো কড়া চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্রে গাছটার মাথা ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট, নয় তো বৈকালের রাঙা রোদ অলসভাবে গাছটার মাথায় জড়াইয়া আছে।

সকালের চেয়ে এই বৈকালের রাঙা-রোদ-মাখানো গাছটার দিকে চাহিয়াই তাহার মন কেমন করিত। কর্ণ যেন ওই অশ্বত্থ গাছটার ওপারে আকাশের তলে, অনেক দূরে কোথায় এখনও মাটি হইতে রথের চাকা দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিতেছে — রোজই তোলে — মহাবীর, কিন্তু চিরদিনের কৃপার পাত্র কর্ণ!

এক একদিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনি শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয় যুদ্ধ জিনিসটা মহাভারতে বড়ো কম লেখা আছে। ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এবং আশ মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করিবার জন্য সে এক উপায় বাহির করিয়াছে। একটা বাখারি কিংবা হালকা কোনো গাছের ডালকে অস্ত্রস্বরূপ হাতে লইয়া সে বাড়ির পিছনে বাঁশবাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপনমনে বলে ---

তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশ বাণ ছুঁড়লেন, অর্জুন করলেন কী, একেবারে দুশোটা বাণ দিলেন মেরে! তারপর — ওঃ — সে কী যুদ্ধ। কী যুদ্ধ! বাণের চোটে চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেল! (এখানে সে মনে মনে যতগুলি বাণ হইলে তাহার আশা মিটে তাহার কল্পনা করে, যদিও তাহার কল্পনার ধারা মা-র মুখে কাশীদাসী মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে যাহা শুনা আছে তাহা অতিক্রম করে না) তারপর তো অর্জুন করলেন কী, ঢাল তরোয়াল নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন — পরে এই যুদ্ধ! দুর্যোধন এলেন — ভীম এলেন — বাণে বাণে আকাশ অন্ধকার করে ফেলেছে — আর কিছু দেখা গেল না।... মহাভারতের রথিগণ মাত্র অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া নাম কিনিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রক্ত-মাংসের দেহে জীবন্ত থাকিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, যশোলাভের পথ ক্রমশই কীরূপ দুর্গম হইয়া পড়িতেছে। বালকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে তাঁহারা মাসের পর মাস সমানভাবে অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন কি?

গ্রীষ্মকালের দিনটা, বৈশাখের মাঝামাঝি!

নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের ধারে সেদিন দুপুরের কিছু পূর্বে দ্রোণগুরু বড়ো বিপদে পড়িয়াছেন — কপিধ্বজ রথ একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপরে, গাণ্ডীব-ধনু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্ত হইবার বিলম্ব চক্ষের পলক মাত্র, কুরুসৈন্যদলে হাহাকার উঠিয়াছে — এমন সময় শেওড়া বনের ওদিক হইতে হঠাৎ কে কৌতুকের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, — ও কী রে অপু? অপু চমকিয়া উঠিয়া আকর্ণ টানা জ্যা-কে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল তাহার দিদি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। অপু চাহিতেই বলিল — হ্যাঁরে পাগলা, আপন মনে কী বকচিস বিড়বিড় করে, আর হাত পা নাড়চিস? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে ভাই-এর কচি গালে চুমু খাইয়া বলিল — পাগল!... কোথাকার একটা পাগল, কী বকছিলি রে আপন মনে?

অপু লজ্জিত মুখে বারবার বলিতে লাগিল — যাঃ ... বকছিলাম বুঝি? ... আচ্ছা, যাঃ —

অবশেষে দুর্গা হাসি থামাইয়া বলিল — আয় আমার সঙ্গে ...

পরে সে অপুর হাত ধরিয়া বনের মধ্যে লইয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া হাসিমুখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল — দেখেচিস্? ... কত নোনা পেকেচে? ... এখন কী করে পাড়া যায় বল দিকি?

অপু বলিল — উঃ অনেক রে দিদি! — একটা কঞ্চি দিয়ে পাড়া যায় না?

দুর্গা বলিল — তুই এক কাজ কর, ছুটে গিয়ে বাড়ির মধ্যে থেকে আঁকুশিটা নিয়ে আয় দিকি! আঁকুশি দিয়ে টান দিলে পড়ে যাবে দেখিস এখন —

অপু বলিল — তুই এখানে দাঁড়া দিদি, আমি আনচি।

অপু আঁকুশি আনিলে দুজনে মিলিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও চার-পাঁচটার বেশি ফল পাড়িতে পারিল না — খুব উঁচু গাছ, সর্বোচ্চ ডালে যে ফল আছে তাহা দুর্গা আঁকুশি দিয়াও নাগাল পাইল না। পরে সে বলিল — চল আজ এইগুলো নিয়ে যাই, নাইবার বেলায় মাকে সঙ্গে আনব — মার হাতে ঠিক নাগাল আসবে। দে নোনাগুলো আমার কাছে, তুই আঁকুশিটা নে। নোলক পরবি?

একটা নীচু ঝোপের মাথায় ওড়কলমি লতায় সাদা সাদা ফুলের কুঁড়ি, দুর্গা হাতের ফলগুলো নামাইয়া নিকটের ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়িতে লাগিল। বলিল — এদিকে সরে আয়, নোলক পরিয়ে দি —

তাহার দিদি ওড়কলমি ফুলের নোলক পরিতে ভালোবাসে, বনজঙ্গল সন্ধান করিয়া সে প্রায়ই খুঁজিয়া আনিয়া নিজে পরে ও ইতিপূর্বে কয়েকবার অপুকেও পরাইয়াছে! অপু কিন্তু মনে মনে নোলক পরা পছন্দ করে না। তাহার ইচ্ছা হইল বলে, নোলকে তাহার দরকার নাই। তবে দিদির ভয়ে সে কিছু

বলিল না। দিদিকে চটাইবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই, কারণ দিদিই বনজঙ্গল ঘুরিয়া কুলটা, জামটা, নোনাটা, আমড়াটা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে লুকাইয়া খাওয়ায়, এমন সব জিনিস জুটাইয়া আনে, যাহা হয়তো কুপথ্য হিসাবে উহাদের খাইতে নিষেধ আছে। কাজেই অন্যায় হইলেও দিদির কথা না শুনা তাহার সাহসে কুলায় না।

একটা কুঁড়ি ভাঙিয়া সাদা জলের মতো যে আঠা বাহির হইল, তাহার সাহায্যে দুর্গা অপুর নাকে কুঁড়িটি আঁটিয়া দিল, পরে নিজেও একটা পরিল — তারপর ভাইয়ের চিবুকে হাত দিয়া নিজের দিকে ভালো করিয়া ফিরাইয়া বলিল — দেখি, কেমন দেখাচ্ছে? বাঃ বেশ হয়েছে — চল মাকে দেখাইগে —

অপু লজ্জিত মুখে বলিল — না দিদি —

— চল না — খুলে ফেলিস্‌নে যেন — বেশ হয়েচে —

বাড়ি আসিয়া দুর্গা নোনাফলগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া রাখিল। সর্বজয়া রাঁধিতেছিল — দেখিয়া খুব খুশি হইয়া বলিল — কোথায় পেলি রে?

দুর্গা বলিল — ওই লিচু জঙ্গলে — অনেক আছে, কাল গিয়ে তুমি পাড়বে মা? এমন পাকা — একেবারে সিঁদুরের মতো রাঙা —

সে আড়াল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল — দ্যাখো মা —

অপু নোলক পরিয়া দিদির পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। সর্বজয়া হাসিয়া বলিল — ও মা! ও আবার কে রে? — কে চিনতেত পারচি নে?

অপু লজ্জায় তাড়াতাড়ি নাকের ডগা হইতে ফুলের কুঁড়ি খুলিয়া ফেলিল। বলিল — ওই দিদি পরিয়ে দিয়েচে —

দুর্গা হঠাৎ বলিয়া উঠিল — চল রে অপু, ওই কোথায় ডুগডুগি বাজচে, চল, বাঁদর খেলাতে এসেচে ঠিক, শিগগির আয় —

আগে আগে দুর্গা ও তাহার পিছনে পিছনে অপু ছুটিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। সম্মুখে পথ বাহিয়া, বাঁদর নয়, ও পাড়ার চিনিবাস ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। চিনিবাস হরিহর রায়ের দুয়ার দিয়া গেলেও এ বাড়ি ঢুকিল না। কারণ সে জানে এ বাড়ির লোক কখনও কিছু কেনে না। তবুও দুর্গা-অপুকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল — চাই নাকি?

অপু দিদির মুখের দিকে চাহিল। দুর্গা চিনিবাসের দিকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল — নাঃ—

চিনিবাস ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি গিয়া মাথার চাঙারি নামাইতেই বাড়ির ছেলে-মেয়েরা কলরব করিতে করিতে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভুবন মুখুজ্যে অবস্থাপন্ন লোক, বাড়িতে পাঁচ-ছয়টা গোলা আছে, এ গ্রামে অন্নদা রায়ের নীচেই জমিজমা ও সম্পত্তি বিষয়ে তাঁহার নাম করা যাইতে পারে।

ভুবন মুখুজ্যের স্ত্রী বহুদিন মারা গিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার সেজো ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী এ সংসারের কর্ত্রী।

সেজো-বউ-এর বয়স চল্লিশের উপর হইবে, অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

সেজো-বউ একখানা মাজা পিতলের সরায় করিয়া চিনিবাসের নিকট হইতে মুড়কি, সন্দেশ, বাতাসা দশহরা পূজার জন্য লইলেন। ভুবন মুখুজ্যের ছেলেমেয়ে ও তাঁহার নিজের ছেলে সুনীল সেইখানেই

দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের জন্যও খাবার কিনিলেন। পরে অপুকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা চিনিবাসের পিছন পিছন ঢুকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সেজো বউ নিজের ছেলে সুনীলের কাঁধে হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন — যাও না, রোয়াকে উঠে গিয়ে খাও না। এখানে ঠাকুরের জিনিস, মুখ থেকে ফেলে এঁটো করে বসবে।

চিনিবাস চাঙারি মাথায় তুলিয়া পুনরায় অন্য বাড়ি চলিল। দুর্গা বলিল — আয় অপু, চল্ দেখিগে টুনুদের বাড়ি —

ইহারা সদর দরজা পার হইতেই সেজো-বউ মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন — দেখতে পারিনে বাপু, ছুঁড়িটার যে কী হ্যাংলা স্বভাব — নিজের বাড়ি আছে, গিয়ে বসে কিনে খেগে যা না? তা না লোকের দোর দোর —যেমন মা তেমনি ছা —

ইহাদের বাটীর বাহির হইয়া দুর্গা ভাইকে আশ্বাস দিবার সুরে বলিল — চিনিবাসের ভারি তো খাবার! বাবার কাছ থেকে দেখিস রথের সময় চারটে পয়সা নেব — তুই দুটো, আমি দুটো। তুই আমি মুড়কি কিনে খাব —

খানিকটা পরে ভাবিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল — রথের আর কতদিন আছে রে দিদি?

৪

কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া একবাটি দুধ-ভাত মাখিয়া পুত্রকে খাওয়াইতে বসিল। দেখি হাঁ কর্ — তোমার কপালখানা — মণ্ডা না মেঠাই না, দুটো ভাত আর ভাত — তা ছেলের দশা দেখলে হয়ে আসে — রোজ ভাত খেতে বসে মুখ কাঁচুমাচু — বাঁচবে কী খেয়ে? বাঁচতে কি এসেচ? আমায় জ্বালাতে এসেচ বই তো নয় — ও-রকম মুখ ঘুরিয়ো না, ছিঃ — হাঁ করো লক্ষ্মী — দেখি এই দলাটা হলেই হয়ে গেল — আবার ওবেলা টুনুদের বাড়ি মনসার ভাসান হবে। তুই জানিস নে বুঝি? শিগ্‌গির খেয়ে নিয়ে চল। আমরা সব —

দুর্গা বাড়ি ঢুকিল। কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিতেছে। এক পা ধূলা, কপালের সামনে একগোছা চুল সোজা হইয়া প্রায় চার আঙুল উঁচু হইয়া আছে। সে সবসময় আপন মনে ঘুরিতেছে — পাড়ার সমবয়সি ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাহার বড়ো একটা খেলাধূলা নাই — কোথায় কোন ঝোপে বৈঁচি পাকিল, কাদের বাগানে কোন গাছটায় আমের গুটি বাঁধিয়াছে, কোন বাঁশতলায় শেয়াকুল খাইতে মিষ্ট — এসব তাহার নখদর্পণে। পথে চলিতে চলিতে সে সর্বদা পথের দুই পাশে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে চলিয়াছে — কোথাও কাঁচপোকা বসিয়া আছে কিনা! যদি কোথাও কণ্টিকারী গাছের পাকা ফল দেখিতে পাইল,

তৎক্ষণাৎ খেলাঘরের বেগুন করিবার জন্য তাহা তুলিতে বসিয়া যাইবে। হয়তো পথে কোথাও বসিয়া সে নানারকমের খাপরা লইয়া ছুড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, গঙ্গা-যমুনা খেলায় কোনখানায় ভালো তাক হয় — পরীক্ষায় যেখানা ভালো বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সেখানা সে সযত্নে আঁচলে বাঁধিয়া লইবে। সর্বদাই সে পুতুলের বাক্স ও খেলাঘরের সরঞ্জাম লইয়া মহাব্যস্ত।

সে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। সর্বজয়া বলিল — এলে! এসো, ভাত তৈরি। খেয়ে আমায় উদ্ধার করো — তারপর আবার কোন দিকে বেরুতে হবে বেরোও। বোশেখ মাসের দিন সকলের মেয়ে দেখোগে যাও সেঁজুতি করচে, শিবপুজো করচে — আর অত বড়ো ধাড়ি মেয়ে — দিনরাত কেবল টো টো। সেই সকাল হতে না হতে বেরিয়েচে, আর এখন এই দুপুর ঘুরে গিয়েচে, এখন এল বাড়ি — মাথাটার ছিরি দেখো না! না একটু তেল দেওয়া, না একটু চিরুনি ছোঁয়ানো —

সর্বজয়ার কথা শেষ হইবার পূর্বেই এক ব্যাপার ঘটিল। আগে আগে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির সেজ ঠাকরুণ পিছনে পিছনে তাঁহার মেয়ে টুনু ও দেওরের ছেলে সতু, তাহাদের পিছনে আর চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে সম্মুখের দরজা দিয়া বাড়ি ঢুকিল। সেজ ঠাকরুণ কোনো দিকে না চাহিয়া বাড়ির কাহারও সহিত কোনো আলাপ না করিয়া সোজা হন হন করিয়া ভিতরের দিকের রোয়াকে উঠিলেন। নিজের ছেলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন — কই নিয়ে আয় — বের কর পুতুলের বাক্স, দেখি —

এ বাড়ির কেহ কোনো কথা বলিবার পূর্বেই টুনু ও সতু দুজনে মিলিয়া দুর্গার টিনের পুতুলের বাক্সটা ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রোয়াকে নামাইল এবং টুনু বাক্স খুলিয়া খানিকটা খুঁজিবার পর একছড়া পুঁতির মালা বাহির করিয়া বলিল — এই দ্যাখো মা, আমার সেই মালাটা — সেদিন যে সেই খেলতে গিয়েছিল, সেদিন চুরি করে এনেচে।

সতু বাক্সের এক কোণ সন্ধান করিয়া গোটাকতক আমের গুটি বাহির করিয়া বলিল — এই দেখো জেঠিমা, আমাদের সোনামুখী গাছের আম পেড়ে এনেচে।

ব্যাপারটা এত হঠাৎ হইয়া গেল বা ইহাদের গতিবিধি এ বাড়ির সকলের কাছেই এত রহস্যময় মনে হইল যে এতক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হয় নাই। এতক্ষণ পরে সর্বজয়া কথা খুঁজিয়া বলিল — কী, কী খুড়িমা? কী হয়েচে? পরে সে রান্নাঘরের দাওয়া হইতে ব্যগ্রভাবে উঠিয়া আসিল।

— এই দেখো না কী হয়েচে, কীর্তিখানা দেখো না একবার — তোমার মেয়ে সেদিন খেলতে গিয়ে টুনুর পুতুলের বাক্স থেকে এই পুঁতির মালা চুরি করে নিয়ে এসেচে — মেয়ে কদিন থেকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তারপর সতু গিয়ে বললে যে, তোর পুঁতির মালা দুগ্‌গাদিদির বাক্সের মধ্যে দেখে এলাম — দেখো একবার কাণ্ড — তোমার ও মেয়ে কম নাকি? চোর — চোরের বেহদ্দ চোর — আর ওই দেখো না — বাগানের আমগুলো গুটি পড়তে দেরি সয় না — চুরি করে নিয়ে এসে বাক্সে লুকিয়ে রেখেচে।

যুগপৎ দুই চুরির অতর্কিততায় আড়ষ্ট হইয়া দুর্গা পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল — এনিচিস এই মালা ওদের বাড়ি থেকে?

দুর্গা কথার উত্তর দিতে না দিতে সেজো বউ বলিলেন — না আনলে কি আর মিথ্যে করে বলচি

নাকি! বলি এই আম কটা দেখো না? সোনামুখীর আম চেন না না কি? এও কি মিথ্যে কথা?

সর্বজয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল — না সেজোখুড়ি, আপনার কথা মিথ্যে তা তো বলিনি! আমি ওকে জিগ্যেস করচি।

সেজো ঠাকরুণ হাত নাড়িয়া ঝাঁজের সহিত বলিলেন — জিজ্ঞেস করো আর যা করো বাপু, ও মেয়ে সোজা মেয়ে হবে না আমি বলে দিচ্চি — এই বয়েসে যখন চুরিবিদ্যে ধরেচে, তখন এর পর যা হবে সে টেরই পাবে। চল রে সতু — নে আমের গুটিগুলো বেঁধে নে — বাগানের আমগুলো লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ির জ্বালায় যদি চোখে দেখবার জো আছে!

অপমানে দুঃখে সর্বজয়ার চোখে জল আসিল। সে ফিরিয়া দুর্গার রুক্ষ চুলের গোছা টানিয়া ধরিয়া ডাল-ভাত মাখা হাতেই দুড়-দাড় করিয়া তাহার পিঠে কিলের উপর কিল ও চড়ের উপর চড় মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল—আপদ-বালাই একটা কোত্থেকে এসে জুটেছে—মলে ও আপদ চুকে যায়—মরেও না যে বাঁচি—হাড় জুড়োয়—বেরো বাড়ি থেকে, দূর হয়ে যা—যা এক্ষুনি বেরো—

দুর্গা মার খাইতে খাইতে ভয়ে খিড়কি-দোর দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার ছেঁড়া রুক্ষ চুলের গোছা দু-এক গাছা সর্বজয়ার হাতে থাকিয়া গেল।

অপু খাইতে খাইতে অবাক হইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। দিদি পুঁতির মালা চুরি করিয়া আনিয়াছিল কিনা তাহা সে জানে না—পুঁতির মালাটা সে ইহার আগে কোনও দিনও দেখে নাই—কিন্তু আমের গুটি যে চুরির জিনিস নয় তাহা সে নিজে জানে। কাল বৈকালে দিদি তাহাকে সঙ্গে করিয়া টুনুদের বাগানে আম কুড়াইতে গিয়াছিল এবং সোনামুখীর তলায় আম কটা পড়িয়াছিল, দিদি কুড়াইয়া লইল, সে জানে। কাল হইতে অনেকবার দিদি বলিয়াছে, —ও অপু, এবার সেই আমের গুটিগুলো জারাব, কেমন তো! কিন্তু মা অসুবিধাজনকভাবে বাড়ি উপস্থিত থাকার দরুন উক্ত প্রস্তাব আর কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। দিদির অত্যন্ত আশার জিনিস আমগুলো এভাবে লইয়া গেল, তাহার উপর আবার দিদি এরূপ ভাবে মারও খাইল। দিদির চুল ছিঁড়িয়া দেওয়ায় মায়ের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। যখন তাহার দিদির মাথার সামনে রুক্ষ চুলের এক গোছা খাড়া হইয়া বাতাসে উড়ে—তখনই কী জানি কেন, দিদির উপর অত্যন্ত মমতা হয়—কেমন যেন মনে হয়, দিদির কেহ কোথাও নাই—সে যেন একা কোথা হইতে আসিয়াছে—উহার সাথি কেহ এখানে নাই। কেবলই মনে হয়, কেমন করিয়া সে দিদির সকল দুঃখ ঘুচাইয়া দিবে—সকল অভাব পূরণ করিয়া তুলিবে। তাহার দিদিকে সে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না।

খাওয়ার পরে অপু মায়ের ভয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার মন থাকিয়া থাকিয়া কেবলই বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছিল। বেলা একটু পড়িলে সে টুনুদের বাড়ি, পটলিদের বাড়ি, নেড়াদের বাড়ি—একে একে সকল বাড়ি খুঁজিল—দিদি কোথাও নাই। রাজকৃষ্ণ পালিতের স্ত্রী ঘাট হইতে জল লইয়া আসিতেছিলেন—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—জেঠিমা, আমার দিদিকে দেখেচো? সে আজ ভাত খায়নি,—কিচ্ছু খায়নি —মা তাকে আজ বড্ড মেরেচে—মার খেয়ে কোথায় পালিয়েচে দেখেচো জেঠিমা?

বাড়ির পাশের পথ দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিল—বাঁশবাগানে সে যদি বসিয়া থাকে? সেদিকে গিয়া সমস্ত খুঁজিয়া দেখিল। সে খিড়কি-দরজা দিয়া বাড়ি ঢুকিয়া দেখিল বাড়িতে কেহ নাই! তাহার মা বোধহয় ঘাটে কি অন্য কোথাও গিয়াছে। বাড়িতে বৈকালের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে। সম্মুখের দরজার কাছে যে বাঁশঝাড় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার একগাছা ঝুলিয়া-পড়া শুকনো কঞ্চিতে তাহার পরিচিত সেই লেজঝোলা হলদে পাখিটা আসিয়া বসিয়াছে। রোজই সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সে কোথা হইতে আসিয়া এই বাঁশঝাড়ের ওই কঞ্চিখানার উপর বসে—রোজ—রোজ—রোজ। আরও কত কী পাখি চারিদিকের বনে কিচ কিচ করিতেছে। নীলমণি রায়েদের পোড়ো ভিটা গাছপালার ঘন ছায়ায় ভরিয়া গিয়াছে। তাহার মন হঠাৎ হু হু করিয়া উঠিল। কতক্ষণ হইল, সেই গিয়াছে, বাড়ি আসে নাই, খায় নাই—কোথায় গেল দিদি?

ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির ছেলেমেয়েরা মিলিয়া উঠানে ছুটাছুটি করিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। রানু তাহাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল—ভাই, অপু এসেচে...ও আমাদের দিকে হবে, আয়রে অপু।

অপু তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি খেলব না রানুদি—দিদিকে দেখেচো?

রানু জিজ্ঞাসা করিল—দুগ্‌গা? না, তাকে তো দেখিনি! বকুলতলায় নেই তো?

বকুলতলার কথা তাহার মনেই হয় নাই। সেখানে দুর্গা প্রায়ই থাকে বটে! ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি হইতে সে বকুলতলায় গেল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—বকুলগাছটা অনেক দূর পর্যন্ত জুড়িয়া ডালপালা ছড়াইয়া ঝুপসি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তলাটা অন্ধকার। কেহ কোথাও নাই, ...যদি কোনোদিকে গাছপালার আড়ালে থাকে! সে ডাক দিল—দিদি, ও দিদি! দিদি?

অন্ধকার গাছটায় কেবল কতকগুলা বক পাখা ঝটপট করিতেছে মাত্র। অপু ভয়ে ভয়ে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল। বকুলতলি হইতে একটু দূরে ডোবার ধারে খেজুর গাছ আছে, এখন ডাঁশা খেজুরের সময়, সেখানেও তাহার দিদি মাঝে মাঝে থাকে বটে। কিন্তু অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, ডোবাটার দুই ধারে বাঁশবন, সেখানে যাইয়া দেখিতে তাহার সাহস হইল না। বকুলগাছের গুঁড়ির কাছে সরিয়া গিয়া সে দুই-একবার চিৎকার করিয়া ডাকিল—ভাঁটশেওড়া বনে কী একটা জন্তু তাহার গলার সাড়া পাইয়া খস খস শব্দ করিয়া ডোবার দিকে পলাইল।

বাড়ির পথে ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সামনে সেই গাব গাছটা! একা সন্ধ্যার পর এ গাবগাছের তলার পথ দিয়া যাওয়া! সর্বনাশ! গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। কেন যে তাহার এই গাছটির নীচে দিয়া যাইতে ভয় করে, তাহা সে জানে না। কোনো কারণ নাই, এমনিই ভয় করে এবং কারণ কিছু নাই বলিয়া ভয় অত্যন্ত বেশি করে।

অপু খানিকক্ষণ অন্ধকার গাবতলাটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিল। তাহাদের বাড়ি যাইবার আর একটি পথ আছে—একটুখানি ঘুরিয়া পটলিদের বাড়ির উঠান দিয়া গেলে গাবতলার এ অজানা বিভীষিকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। পটলির ঠাকুরমা সন্ধ্যার সময় বাড়ির রোয়াকে ছেলেপিলেদের লইয়া হাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। পটলির মা রান্নাঘরে রাঁধিতেছেন উঠানের মাচাতলায় বিধু জেলেনি দাঁড়াইয়া মাছ বিক্রয়ের পয়সা তাগাদা করিতেছে।

অপু বলিল — দিদিকে খুঁজতে গিয়েছিলাম ঠাকুমা — বকুলতলা থেকে আসতে আসতে —

ঠাকুমা বলিলেন — দুগ্‌গা এই তো বাড়ি গেল। এই কতক্ষণ যাচ্ছে — ছুটে যা দিকি — বোধহয় এখনও বাড়ি গিয়ে পৌঁছায়নি —

সে এক দৌড়ে বাড়ির দিকে ছুটিল। পিছন হইতে পটলির বোন রাজী চেঁচাইয়া বলিল — কাল সকালে আসিস অপু — আমরা গঙ্গা-যমুনা খেলার নতুন ঘর কেটেছি। ঢেঁকশালের পেছনে নিমতলায় — দুগ্‌গাকে বলিস —

তাহাদের বাড়ির কাছে আসিয়া পৌঁছিয়া হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল — দুর্গা আর্তস্বরে চিৎকার করিতে করিতে বাড়ির দরজা দিয়া দৌড়াইয়া বাহির হইতেছে — পিছনে পিছনে তাহার মা কী একটা হাতে মারিতে মারিতে তাড়া করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

দুর্গা গাবতলার পথ দিয়া ছুটিয়া পলাইল, মা দরজা হইতে ধাবমানা মেয়ের পিছনে চেঁচাইয়া বলিল — যাও, বেরোও — একেবারে জন্মের মতো যাও — আর কক্ষনো বাড়ি যেন ঢুকতে না হয় — বালাই, আপদ চুকে যাক — একেবারে ছাতিমতলায় দিয়ে আসি।

ছাতিমতলায় গ্রামের শ্মশান। অপুর সমস্ত শরীর যেন জমিয়া পাথরের মতো আড়ষ্ট ও ভারী হইয়া গেল। তাহার মা সবেমাত্র ভিতরের বাড়িতে ঢুকিয়া মাটির প্রদীপটি রোয়াকের ধার হইতে উঠাইয়া লইতেছে। সে পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ি ঢুকিতেছে তাহার মা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল — তুমি আবার এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে শুনি? মোটে তো আজ ভাত খেয়েচো!

তাহার মনে নানা প্রশ্ন জাগিতেছিল। দিদি আবার মার খাইল কেন? সে এতক্ষণ কোথায় ছিল? দুপুরবেলা দিদি কী খাইল? সে কী আবার কোনো জিনিস চুরি করিয়া আনিয়াছে? কিন্তু ভয়ে কোনো কথা না বলিয়া সে কলের পুতুলের মতো মায়ের কথা মতো কাজ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। পরে ভয়ে ভয়ে প্রদীপ উসকাইয়া নিজের ছোটো বইয়ের দপ্তরটি বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। সে পড়ে মোটে তৃতীয় ভাগ — কিন্তু দপ্তরে দু-খানা মোটা ভারী ইংরাজি কী বই, কবিরাজি ঔষধের তালিকা, একখানি পাতা-ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালি, একখানি ১৩০৩ সালের পুরাতন পাঁজি প্রভৃতি আছে। সে নানাস্থান হইতে চাহিয়া এগুলি জোগাড় করিয়াছে এবং এগুলি না পড়িতে পারিলেও রোজ একবার করিয়া খুলিয়া দেখে।

খানিকক্ষণ দেয়ালের দিকে চাহিয়া সে কী ভাবিল। পরে আর একবার প্রদীপ উসকাইয়া দিয়া পাতা-ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালিখানি খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে পাতা উলটাইতেছে, এমন সময়ে সর্বজয়া একবাটি দুধ হাতে করিয়া ঢুকিয়া বলিল, — এসো, খেয়ে নাও দিকি!

অপু দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটি উঠাইয়া দুধ চুমুক দিয়া খাইতে লাগিল। অন্যদিন হইলে এত সহজে দুধ খাইতে তাহাকে রাজি করানো খুব কঠিন হইত। একটুখানি মাত্র খাইয়া সে বাটি মুখ হইতে নামাইল। সর্বজয়া বলিল — ওকি? নাও সবটুকু খেয়ে ফেলো — ওইটুকু দুধ ফেললে তবে বাঁচবে কী খেয়ে —

অপু বিনা প্রতিবাদে দুধের বাটি পুনরায় মুখে উঠাইল। সর্বজয়া দেখিল সে মুখে বাটি ধরিয়া রহিয়াছে

কিন্তু চুমুক দিতেছে না — তাহার বাটিসুদ্ধ হাতটি কাঁপিতেছে ... পরে অনেকক্ষণ মুখে ধরিয়া রাখিয়া হঠাৎ বাটি নামাইয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। সর্বজয়া আশ্চর্য হইয়া বলিল — কী হলো রে? কী হয়েচে, জিভ কামড়ে ফেলেছিস?

অপু মায়ের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বাঁধ না মানিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল — দিদির জন্য বড্ড মন কেমন করছে!...

সর্বজয়া অল্পক্ষণ মাত্র চুপ করিয়া বসিয়া পরে সরিয়া আসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শান্তসুরে বলিতে লাগিল — কেঁদো না, অমন করে কেঁদো না, — ওই পটলিদের কী নেড়াদের বাড়ি বসে আছে — কোথায় যাবে অন্ধকারে? কম দুষ্টু মেয়ে নাকি? সেই দুপুরবেলা বেরুল — সমস্ত দিনের মধ্যে আর চুলের টিকি দেখা গেল না — না খাওয়া, না দাওয়া, কোথায় ও পাড়ার পালিতদের বাগানে বসে ছিল, সেখানে বসে কাঁচা আম আর জামরুল খেয়েছে, এক্ষুনি ডাকতে পাঠাচ্ছি — কেঁদো না অমন করে।

পরে সে আঁচল দিয়া ছেলের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বাকি দুধটুকু খাওয়াইবার জন্য বাটি তাহার মুখে তুলিয়া ধরিল — হাঁ করো দিকি, লক্ষ্মী সোনা, উনি এলেই ডেকে আনবেন এখন — একেবারে পাগল — কোত্থেকে একটা পাগল এসে জন্মেছে — আর এক চুমুক — হ্যাঁ —

রাত অনেক হইয়াছে। উত্তরের ঘরের তক্তাপোশে অপু ও দুর্গা শুইয়া আছে। অপুর পাশে তাহার মায়ের শুইবার জায়গা খালি আছে। কারণ মা এখনও রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসে নাই। তাহার বাবা আহারাদি সারিয়া পাশের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। বাবা বাড়ি আসিয়া দুর্গাকে পাড়া হইতে খুঁজিয়া আনিয়াছেন।

বাড়ি আসিয়া পর্যন্ত দুর্গা কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলে নাই। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছে। অপু দুর্গার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল — দিদি, মা কী দিয়ে মেরেছিল রে সন্ধেবেলা? তোর চুল ছিঁড়ে দিয়েচে? —

দুর্গার মুখে কোনো কথা নাই।

সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল — আমার উপর রাগ করেচিস দিদি? আমি তো কিছু করিনি।

দুর্গা আস্তে আস্তে বলিল — না বইকি! তবে সতু কী করে টের পেল যে পুঁতির মালা আমার বাক্সে আছে?

অপু প্রতিবাদের উত্তেজনায় উঠিয়া বসিল। না — সত্যি — আমি তোর গা ছুঁয়ে বলচি দিদি, আমি তো দেখাইনি। আমি জানিনে যে তোর বাক্সে আছে — কাল সতু বিকেলবেলা এসেছিল, ওর সেই বড়ো রাঙা ভাঁটাটা নিয়ে আমরা খেলছিলাম — তারপর, বুঝলি দিদি, সতু তোর পুতুলের বাক্স খুলে কী দেখছিল — আমি বল্লাম, ভাই, তুমি দিদির বাক্সে হাত দিয়ো না — দিদি আমাকে বকে — সেইসময়ে দেখেচে —

পরে সে দুর্গার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল — খুব লেগেচে রে দিদি? কোথায় মেরেচে মা?

দুর্গা বলিল — আমার কানের পাশে মা একটা বাড়ি যা মেরেচে — রক্ত বেরিয়েছিল, এখনও কন্ কন্ কচ্ছে, এইখানে এই দ্যাখ হাত দিয়ে! এই —

এইখানে? তাই তো রে! কেটে গিয়েছে যে? একটু পিদিমের তেল লাগিয়ে দেবো দিদি?

থাকগে — কাল পালিতদের বাগানে বিকেলবেলা যাব বুঝলি? কামরাঙা যা পেকেছে! এই এত বড়ো বড়ো, কাউকে যেন বলিসনে! তুই আর আমি চুপি চুপি যাব — আমি আজ দুপুরবেলা দুটো পেড়ে খেয়েছি — মিষ্টি যেন গুড় —

৫

এদিনের ব্যাপারটি এইরূপে ঘটিল।

অপু বাবার আদেশে তালপাতায় সাতখানা ক খ হাতের লেখা শেষ করিয়া কী করা যায় ভাবিতে ভাবিতে বাড়ির মধ্যে দিদিকে খুঁজিতে গেল। দুর্গা মায়ের ভয়ে সকালে নাহিয়া আসিয়া ভিতরের উঠানের পেঁপেতলায় পুণ্যিপুকুরের ব্রত করিতেছে। উঠানে ছোট্ট চৌকোণা গর্ত কাটিয়া তাহার চারিধারে ছোলা, মটর ছড়াইয়া দিয়াছিল — ভিজা মাটিতে সেগুলির অঙ্কুর বাহির হইয়াছে — চারিদিকে কলার ছোটো বোগ পুঁতিয়া ধারে পিটুলিগোলার আলপনা দিতেছে — পদ্মলতা, পাখি, ধানের শিষ, নতুন ওঠা সূর্য। দুর্গা বলিল, দাঁড়া, মন্তরটা বলে চল এক জায়গায় যাব।

— কোথা রে, দিদি —

— চল না, নিয়ে যাব এখন, দেখিস এখন —। পরে আনুষঙ্গিক বিধি-অনুষ্ঠান সাঙ্গ করিয়া সে এক নিশ্বাসে আবৃত্তি করিতে লাগিল —

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পূজে রে দুপুরবেলা?
আমি সতী লীলাবতী ভায়ের বোন ভাগ্যবতী —

ব্রতানুষ্ঠান শেষ করিয়া দুর্গা বলিল, চল গড়ের পুকুরে অনেক পানফল হয়ে আছে — ভোঁদার মা বলছিল, চল নিয়ে আসি —

কোনকালে গ্রামের আদি বাসিন্দা মজুমদারের বাড়ির চতুর্দিকে যে গড়খাই ছিল তাহার অন্য অংশ এখন ভরাট হইয়া গিয়াছে — কেবল এইখানটিতে বারোমাস জল থাকে, ইহারই নাম গড়ের পুকুর।

সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল পুকুরে পানফল অনেক আছে বটে, কিন্তু কিনারার ধারে বিশেষ কিছু নাই, সবই জল হইতে দূরে। দুর্গা বলিল — অপু, একটা বাঁশের কঞ্চি দ্যাখ তো খুঁজে — তাই দিয়ে টেনে টেনে আনব। পরে সে পুকুরধারের ঝোপের শেওড়াগাছ হইতে পাকা শেওড়ার ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল। অপু বনের মধ্যে কঞ্চি খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইয়া বলিল — ও দিদি, ও ফল খাসনি! — দূর — আশ শ্যাওড়ার ফল কি খায়রে? ও তো পাখিতে খায় —

দুর্গা পাকা ফল টিপিয়া বীজ বাহির করিতে করিতে বলিল — আয় দিকি — দ্যাখ দিকি খেয়ে — মিষ্টি যেন গুড় — কে বলেচে খায় না? আমি তো কত খেইচি।

অপু কঞ্চি কুড়ানো রাখিয়া দিদির কাছে আসিয়া বলিল — খেলে যে বলে পাগল হয়? আমায় একটা দে দিকি, দিদি —

পরে সে খাইয়া মুখ একটু কাঁচুমাচু করিয়া বলিল — এট্টু এট্টু তেতো যে দিদি —

— তা এট্টু তেতো থাকবে না? তা থাক, কেমন মিষ্টি বল দিকি — কথা শেষ করিয়া দুর্গা খুব খুশির সহিত গোটাকতক পাকা ফল মুখের মধ্যে পুরিল।

জন্মিয়া পর্যন্ত ইহারা কখনও কোনো ভালো জিনিস খাইতে পায় নাই। অথচ পৃথিবীতে ইহারা নূতন আসিয়াছে, জিহ্বা ইহাদের নূতন — তাহা পৃথিবীর নানা রস, বিশেষত মিষ্ট রস আস্বাদ করিবার জন্য লালায়িত। সন্দেশ মিঠাই কিনিয়া সে পরিতৃপ্তি লাভ করিবার সুযোগ ইহাদের ঘটে না — বিশ্বের অনন্ত সম্পদের মধ্যে তুচ্ছ বনগাছ হইতে মিষ্টরস আহরণরত এইসব লুব্ধ দরিদ্র ঘরের বালকবালিকাদের জন্য তাই করুণাময়ী বনদেবীরা বনের তুচ্ছ ফুলফল মধুতে ভরাইয়া রাখেন।

ভাইবোনের কলহাস্যে খানিকক্ষণ ধরিয়া পুকুরপ্রান্তের নির্জন বাঁশবাগান মুখরিত হইতে লাগিল।

খানিকটা পরে অপু পাশের একটি শেওড়াগাছের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল — দিদি দ্যাখ কী এখানে। তারপরে সে ছুটিয়া গিয়া মাটি খুঁড়িয়া কী তুলিতে লাগিল।

দুর্গা জিজ্ঞাসা করিল — কী রে? পরে সেও ভাইয়ের কাছে আসিল।

অপু ততক্ষণ মাটি খুঁড়িয়া কী একটি বাহির করিয়া কোঁচর কাপড় দিয়া মাটি মুছিয়া সাফ করিতেছে। হাতে করিয়া আহ্লাদের সহিত দিদিকে দেখাইয়া বলিল — দ্যাখ দিদি, চক্‌চক্ কচ্ছে — কী জিনিস রে?

দুর্গা হাতে লইয়া দেখিল — গোলমতো একদিকে ছুঁচোলো পল-কাটা-কাটা চক্‌চকে কী একটা জিনিস। সে খানিকক্ষণ আগ্রহের সহিত নানাভাবে উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ কী ভাবিয়া তাহার রুক্ষচুলে-ঘেরা মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ দেখিতেছে কিনা। চুপিচুপি বলিল — অপু, এটা বোধহয় হিরে! চুপ কর, চেঁচাসনে। পরে ভয়ে ভয়ে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

অপু দিদির দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। হীরক বস্তুটি তাহার অজ্ঞাত নয় বটে — মায়ের মুখে, দিদির মুখে রূপকথার রাজপুত্র রাজকন্যার হিরা-মুক্তার অলংকারের ঘটনা সে অনেকবার শুনিয়াছে; কিন্তু হিরা জিনিসটা কীরকম দেখিতে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে একটু ভুল ধারণা ছিল। তাহার মনে হইত হিরা দেখিতে মাছের ডিমের মতো, হলদে হলদে, তবে নরম নয় — শক্ত...

সর্বজয়া বাড়ি ছিল না, পাড়া হইতে আসিয়া দেখিল — ছেলেমেয়ে বাড়ির ভিতর দিকে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কাছে যাইতে দুর্গা চুপি চুপি বলিল — মা, একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েচি আমরা। গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিয়েছিলাম মা। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে এইটে পোঁতা ছিল!

অপু বলিল — আমি দেখে দিদিকে বল্লাম, মা।

দুর্গা আঁচল হইতে জিনিসটা খুলিয়া মায়ের হাতে দিয়া বলিল — দেখো দিকি কী এটা মা? — এটা ঠিক হিরে — নয়?

সর্বজয়ারও হীরক সম্বন্ধে ধারণা তাহাদের অপেক্ষা বেশি স্পষ্ট নহে। সে সন্দিগ্ধসুরে জিজ্ঞাসা

করিল — তুই কী করে জানলি হিরে?

দুর্গা বলিল — মজুমদারেরা বড়োলোক ছিল তো মা? ওদের ভিটের জঙ্গলে কারা নাকি মোহর কুড়িয়ে পেয়েছিল। এটা একেবারে পুকুরের ধারে বনের মধ্যে পোঁতা ছিল, রোদ্দুর লেগে চক্‌চক্ কচ্ছিল, — এ ঠিক মা হিরে।

সর্বজয়া বলিল — আগে উনি আসুন, ওকে দেখাই।

দুর্গা বাহিরে উঠানে আসিয়া আহ্লাদের সহিত ভাইকে বলিল — হিরে যদি হয়, তবে দেখিস আমরা বড়োমানুষ হয়ে যাব।

অপু না বুঝিয়া বোকার মতো হি হি করিয়া হাসিল।

খানিকটা পরে একটা পুঁটুলি হাতে হরিহর বাড়ি ঢুকিল।

সর্বজয়া বলিল — ওগো, শোনো, এদিকে এসো তো! দেখো তো এটা কী?

হরিহর হাতে লইয়া বলিল — কোথায় পেলে?

— দুগ্‌গা গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিয়েছিল, কুড়িয়ে পেয়েছে। কী বলো দিকি?

হরিহর খানিকটা উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিয়া বলিল, — কাচ না হয়, পাথর-টাথর হবে — এতটুকু জিনিস, ঠিক বুঝতে পারচিনে।

সর্বজয়ার মনে একটুখানি ক্ষীণ আশার রেখা দেখা দিল — কাচ হইলে তাহার স্বামী কী চিনিতে পারিত না? পরে সে চুপিচুপি, যেন পাছে স্বামী বিরুদ্ধযুক্তি দেখায় এই ভয়ে বলিল — হিরে নয় তো? যদি হিরে হয়!

— হ্যাঁ, হিরে যদি পথেঘাটে পাওয়া যেত তবে আর ভাবনা কী ছিল? তুমিও যেমন !...

তাহার মনে মনে ধারণা হইল ইহা কাচ। পরক্ষণেই কিন্তু মনে হইল হয়তো হইতেও পারে। বলা যায় কী! মজুমদারেরা বড়োলোক ছিল। বিচিত্র কি যে হয়তো তাহাদেরই গহনায়-টহনায় কোনো কালে বসানো ছিল, কী করিয়া মাটির মধ্যে পুঁতিয়া গিয়াছে! কথায় বলে, কপালে না থাকিলে গুপ্তধন হাতে পড়িলেও চেনা যায় না — শেষে কি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্পের মতো ঘটিবে?

সে বলিল — আচ্ছা দাঁড়াও, একবার বরং গাঙ্গুলিবাড়ি দেখিয়ে আসি।

রাঁধিতে রাঁধিতে সর্বজয়া বারবার মনে মনে বলিতে লাগিল — দোহাই ঠাকুর কত লোক তো কত কী কুড়িয়ে পায়। এই কষ্ট যাচ্ছে সংসারে — বাছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ো — দোহাই ঠাকুর!

তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বাড়ি আসিয়া আগ্রহের সুরে বলিল — বাবা এখনও বাড়ি ফেরেনি, হ্যাঁ মা?

সঙ্গে সঙ্গে হরিহর বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া বলিল — হুঁঃ, তখনই আমি বল্লাম এ কিছুই নয়। গাঙ্গুলিমশায়ের জামাই সত্যবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন — তিনি দেখে বল্লেন, একরকম বেলোয়ারি কাচ — ঝাড়-লণ্ঠনে ঝুলোনো থাকে। রাস্তাঘাটে যদি হিরে-জহরত পাওয়া যেত তাহলে ... তুমিও যেমন!

৬

বৈকালের দিকটা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল। অনেকক্ষণ হইতে মেঘ-মেঘ করিতেছিল, তবুও ঝড়টা যেন খুব শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অপুদের বাড়ির সামনে বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলো পাঁচিলের উপর হইতে ঝড়ের বেগে হটিয়া ওধারে পড়াতে বাড়িটা যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতে লাগিল —ধুলা, বাঁশপাতা, কাঁঠালপাতা, খড়, চারিধার হইতে উড়িয়া তাহাদের উঠান ভরাইয়া ফেলিল। দুর্গা বাটীর বাহির হইয়া আম কুড়াইবার জন্য দৌড়িল— অপুও দিদির পিছু পিছু ছুটিল! দুর্গা ছুটিতে ছুটিতে বলিল--- শিগ্‌গির ছোট, তুই বরং সিঁদুরকৌটো-তলায় থাক, আমি যাই সোনামুখীতলায় —দৌড়ো—দৌড়ো। ধুলায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বড়ো বড়ো গাছের ডাল ঝড়ে বাঁকিয়া গাছ নেড়া নেড়া দেখাইতেছে! গাছে গাছে সোঁ সোঁ, বোঁ বোঁ শব্দে বাতাস বাধিতেছে — বাগানে শুকনা ডাল, কুটা, বাঁশের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে— শুকনা বাঁশপাতা ছুঁচালো আগাটি উঁচুদিকে তুলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে উঠিতেছে—কুক্‌শিমা গাছের শুঁয়ার মতো পালকওলা সাদা সাদা ফুল ঝড়ের মুখে কোথা হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতেছে—বাতাসের শব্দে কান পাতা যায় না।

সোনামুখী-তলায় পৌঁছিয়াই অপু মহা-উৎসাহে চিৎকার করিতে করিতে লাফাইয়া এদিক-ওদিক ছুটিতে লাগিল – এই যে দিদি, ওই একটা পড়ল রে দিদি—ওই আর একটা রে দিদি! চিৎকার যতটা করিতে লাগিল তাহার অনুপাতে সে আম কুড়াইতে পারিল না। ঝড় ঘোর রবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ঝড়ের শব্দে আম পড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, যদি বা শোনা যায় ঠিক কোন জায়গা বরাবর শব্দটা হইল—তাহা ধরিতে পারা যায় না। দুর্গা আট-নয়টা আম কুড়াইয়া ফেলিল, অপু এতক্ষণের ছুটাছুটিতে মোটে পাইল দুইটা। তাহাই সে খুশির সহিত দেখাইয়া বলিত লাগিল—এই দ্যাখ দিদি, কত বড়ো দ্যাখ—ওই একটা পড়ল—ওই ওদিকে—

এমন সময় হই-হাই শব্দে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির ছেলেমেয়েরা সব আম কুড়াইতে আসিতেছে শোনা গেল। সতু চেঁচাইয়া বলিল— ও ভাই, দুগ্‌গাদি আর অপু আম কুড়ুচ্ছে—

দল আসিয়া সোনামুখী তলায় পৌঁছিল। সতু বলিল— আমাদের বাগানে কেন এয়েচ আম কুড়ুতে? সেদিন মা বারণ করে দিয়েচে না? দেখি কতগুলো আম কুড়িয়েচো?

পরে দলের দিকে চাহিয়া বলিল— সোনামুখীর কতগুলো আম কুড়িয়েচে দেখছিস টুনু? যাও আমাদের বাগান থেকে দুগ্‌গাদি— মাকে গিয়ে নইলে বলে দেব।

রানু বলিল— কেন তাড়িয়ে দিচ্ছিস সতু? ওরাও কুড়ুক —আমরাও কুড়ুই!

—কুড়োবে বই কী! ও এখানে থাকলে সব আম ওই নেবে। আমাদের বাগানে কেন আসবে ও? না, যাও দুগ্‌গাদি— আমাদের গাছের তলায় থাকতে দেব না।

অন্য সময় হইলে দুর্গা হয়তো সহজে পরাজয় স্বীকার করিত না— কিন্তু সেদিন ইহাদেরই কৃত অভিযোগে মায়ের নিকট মার খাইয়া তাহার পুনরায় বিবাদ বাধাইবার সাহস ছিল না। তাই খুব সহজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়া সে একটু মনমরা ভাবে বলিল —অপু, আয়রে, চল্। পরে হঠাৎ মুখে কৃত্রিম উল্লাসের ভাব আনিয়া বলিল— আমরা সেই জায়গায় যাই চল অপু, এখানে থাকতে না দিলে বয়ে গেল —বুঝলি তো?—এখানকার চেয়েও বড়ো বড়ো আম—তুই আমি মজা করে কুড়োব এখন— চলে আয়— এবং এখানে এতক্ষণ ছিল বলিয়া একটি বৃহত্তর লাভ হইতে বঞ্চিত ছিল, চলিয়া যাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে শাপে বর হইল, সকলের সম্মুখে এইরূপভাব দেখাইয়া যেন অধিকতর উৎসাহের সহিত অপুকে পিছনে লইয়া রাংচিতার বেড়ার ফাঁক গলিয়া বাগানের বাহির হইয়া গেল।

রানু বলিল— কেন ভাই ওদের তাড়িয়ে দিলে— তুমি ভারি হিংসুক কিন্তু সতুদা! রানুর মনে দুর্গার চোখের ভরসাহারা চাহনি বড়ো ঘা দিল।

অপু অতশত বোঝে নাই, বেড়ার বাহিরের পথে আসিয়া বলিল—কোন জায়গায় বড়ো বড়ো আম রে দিদি? পুঁটুদের সলতে-খাগি তলায়?

কোন তলায় দুর্গা তাহা ঠিক করে নাই, একটু ভাবিয়া বলিল— চল। গড়ের পুকুরের ধারের বাগানে যাবি— ওদিকে সব বড়ো বড়ো গাছ আছে— চল।

গড়ের পুকুর এখান হইতে প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া সুঁড়ি পথে অনবরত বন-বাগান অতিক্রম করিয়া তবে পৌঁছানো যায়। অনেক কালের প্রাচীন আম ও কাঁঠালের গাছ— গাছতলার বন-চালতা ময়না-কাঁটা যাঁড়া গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। দূর বলিয়া এবং জনপ্রাণীর বাসশূন্য গভীর বনের মধ্যে বলিয়া এসব স্থানে কেহ বড়ো একটা আম কুড়াইতে আসে না। কাছির মতো মোটা মোটা অনেক কালের পুরোনো গুলঞ্চ লতা এ গাছে ও গাছে দুলিতেছে— বড়ো বড়ো প্রাচীন গাছের তলাকার কাঁটাভরা ঘন ঝোপজঙ্গল খুঁজিয়া তলায় পড়া আম বাহির করা সহজসাধ্য তো নহেই, তাহার উপর আবার ঘনায়মান নিবিড়-কৃষ্ণ ঝোড়ো মেঘে ও বাগানের মধ্যের জঙ্গলে এরূপ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে যে, কোথায় কী ভালো দেখা যায় না। তবুও খুঁজিতে খুঁজিতে নাছোড়বান্দা দুর্গা গোটা আট-দশ আম পাইল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল— ওরে অপু—বিষ্টি এল!

সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টি যেন খানিকক্ষণ একটু নরম হইল— ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাওয়া গেল— একটু পরেই মোটা মোটা ফোঁটায় চড়বড় করিয়া গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল।

দেখিতে দেখিতে চারিদিক ধোঁয়াকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল—বৃষ্টির ফোঁটা পড়িবার জোরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল— ভরপুর টাটকা ভিজা মাটির গন্ধ আসিতে লাগিল। ঝড় একটু যেন নরম হইয়া পড়িয়াছিল— তাহাও আবার বড়ো বাড়িল— দুর্গা যে গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল, এমনি হয়তো হঠাৎ তথায় বৃষ্টি পড়িত না, কিন্তু পুবে হাওয়ার ঝাপটা গাছতলা ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বাড়ি হইতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে—অপু ভয়ের স্বরে বলিল—ও দিদি— বড্ড যে বিষ্টি এল!

— তুই আমার কাছে আয়— দুর্গা তাহাকে কাছে আনিয়া, আঁচল দিয়া ঢাকিয়া কহিল— এ বিষ্টি

আর কতক্ষণ হবে— এই ধরে গেল বলে— বিষ্টি হলো ভালোই হলো— আমরা আবার সোনামুখী তলায় যাব এখন, কেমন তো?

দুজনে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—

নেবুর পাতায় করমচা,

হে বিষ্টি ধরে যা—

ক্কড়—ক্কড়—কড়াৎ... প্রকাণ্ড বন বাগানের অন্ধকার মাথাটা যেন এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত চিরিয়া গেল— চোখের পলকের জন্য চারিধারে আলো হইয়া উঠিল—অপু দুর্গাকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল —ও দিদি!

ভয় কীরে! — নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধরে যা — নেবুর পাতায় করম্‌চা —

বৃষ্টির ঝাপটায় তাহাদের কাপড় চুল ভিজিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। চারিদিকে শুধু মুষলধারে বৃষ্টিপতনের হুস-স-স-স একটানা শব্দ, মেঘের ডাকে কানে তালা ধরিয়া যায়। এক একবার দুর্গার মনে হইতেছিল সমস্ত বাগানখানা ঝড়ে মড়মড় করিয়া উপুড় হইয়া তাহাদের চাপা দিল বুঝি!

ক্কড়—ক্কড়—কড়াৎ

অপু ভয়ে চোখ বুজিল।

দুর্গা শুষ্ক গলায় উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল,— বাজ পড়িতেছে না কি! গাছের মাথায় বন ধুঁধুলের ফল দুলিতেছে।

শীতে অপুর ঠকঠক করিয়া দাঁতে দাঁত লাগিতেছিল—দুর্গা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া শেষ আশ্রয়ের সাহসে বারবার দ্রুত আবৃত্তি করিতে লাগিল— নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধরে যা— নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধরে যা— নেবুর পাতায় করম্‌চা.... ভয়ে তাহার স্বর কাঁপিতেছিল।

সন্ধ্যা হইবার বেশি বিলম্ব নাই। ঝড়-বৃষ্টি খানিকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। পথে জমিয়া যাওয়া বৃষ্টির জলের উপর ছপ ছপ শব্দ করিতে করিতে রাজকৃষ্ণ পালিতের মেয়ে আশালতা পুকুরের ঘাটে যাইতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল— হ্যাঁ মা, দুর্গা আর অপুকে দেখেছিস ওদিকে?

আশালতা বলিল— না খুড়িমা, দেখিনি তো। কোথায় গিয়েচে? তারপর হাসিয়া বলিল— কি ব্যাং-ডাকানি জল হয়ে গেল খুড়িমা!

—সেই ঝড়ের আগে দুজন বেরিয়েচে আম কুড়োতে যাই বলে, আর তো ফেরেনি —এই ঝড় বৃষ্টি গেল, সন্দে হলো, ও মা কোথায় গেল তবে?

সর্বজয়া উদ্‌বিগ্ন মনে বাড়ির মধ্যে ফিরিয়া আসিল। কী করিবে ভাবিতেছে এমন সময় খিড়কির দরজা ঠেলিয়া আপাদমস্তক সিক্ত অবস্থায় দুর্গা আগে আগে একটা ঝুনা নারিকেল হাতে ও পিছনে অপু একটা নারিকেলের বাগলো টানিয়া লইয়া বাড়ি ঢুকিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি ছেলে-মেয়ের কাছে গিয়া বলিল— ও

মা আমার কি হবে! ভিজে যে সব একেবারে পান্তাভাত হইচিস। পরে আহ্লাদের সহিত বলিল— নারকেল কোথা পেলি রে দুর্গা? কোথায় ছিলি বিষ্টির সময়?

অপু ও দুর্গা দুজনেই চাপা কণ্ঠে বলিল— চুপ চুপ মা— সেজজেঠিমা বাগানে যাচ্ছে— এই গেল— ওদের বাগানের বেড়ার ধারের দিকে যে নারকোল গাছটা ওর তলায় পড়ে ছিল। আমরাও বেরুচ্চি সেজজেঠিমাও ঢুকল।

দুর্গা বলিল— অপুকে তো ঠিক দেখেচে— আমাকেও বোধহয় দেখেচে। পরে সে উৎসাহের সঙ্গে অথচ চাপা সুরে বলিতে লাগিল—একেবারে গাছের গোড়ায় পড়ে ছিল মা, আগে আমি টের পাইনি, সোনামুখী তলায় যদি আম পড়ে থাকে তাই দেখতে গিয়ে দেখি বাগলোটা পড়ে রয়েচে। অপুকে বললাম— অপু বাগলোটা নে— মার ঝাঁটার কষ্ট, ঝাঁটা হবে। তারপরই দেখি, — হস্তস্থিত নারিকেলটার দিকে উজ্জ্বল মুখে চাহিয়া বলিল—বেশ বড়ো না মা?

অপু খুশির সুরে হাত নাড়িয়া বলিল— আমি অমনি বাগলোটা নিয়ে ছুট—

সর্বজয়া বলিল—বেশ বড়ো দোমালা নারকেলটা। ছেঁচতলায় রেখে দে, জল দিয়ে নেব—

অপু অনুযোগের সুরে বলিল—তুমি বলো মা নারকোল নেই, নারকোল নেই,— এই তো হলো নারকোল! এইবার কিন্তু বড়া করে দিতে হবে! আমি ছাড়ব না — কখ্খনো—

বৃষ্টির জলে ছেলেমেয়ের মুখ বৃষ্টিধোয়া জুঁই ফুলের মতো সুন্দর দেখাইতেছিল। ঠান্ডায় তাহাদের ঠোঁট নীল হইয়া গিয়াছে, মাথার চুল ভিজিয়া কানের সঙ্গে লেপটাইয়া লাগিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বলিল—আয় সব, কাপড় ছাড়িয়ে দিই আগে, পায়ে জল দিয়ে রোয়াকে ওঠ সব—

খানিক পরে সর্বজয়া কুয়ার জল তুলিতে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি গেল। ভুবন মুখুজ্যের খিড়কি-দোর পর্যন্ত যাইতেই সে শুনিল — সেজঠাকরুন বাড়ির মধ্যে চিৎকার করিয়া বাড়ি মাথায় করিতেছেন।

—একটা মুঠো টাকা খরচ করে তবে বাগান নেওয়া— মাগনা তো নয়। তার কোনো কুটোটা যদি হাঘরেদের জন্যে ঘরে ঢুকবার জো আছে। ওই ছুঁড়িটা রাদ্দিন বাগানে বসে আছে, কুটোগাছটা নিয়ে গিয়ে ঘরে তুলবে—ওমা, ভাবলাম বিষ্টি থেমেচে, যাই একবার বাগানটা গিয়ে দেখে আসি— এই এত বড়ো নারকোলটা কুড়িয়ে নিয়ে একেবারে দুড় দুড় দৌড়!— এত শত্তুরতা যেন ভগবান সহ্যি না করেন—উচ্ছন্ন যান, উচ্ছন্ন যান,—এই ভর সন্দেবেলা বলচি, আর যেন নারকোল খেতে না হয়—একবার শিগগির যেন ছাতিমতলা-সই হন—

সর্বজয়া খিড়কির বাহিরে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেমেয়ের বর্ষণসিক্ত কচিমুখ মনে করিয়া সে ভাবিল যদি গালাগাল ওদের লাগে! বাবা—যে লোক! দাঁতে বিষ আছে! কী করি? কথাটা ভাবিতেই তাহার গা শিহরিয়া উঠিয়া সর্বশরীর যেন অবশ হইয়া গেল। সে আর মুখুজ্যেবাড়ি ঢুকিল না।

ভয়ে ভয়ে সে জল তুলিবার ছোট্ট বালতিটা ও ঘড়া কাঁখে লইয়া বাড়ির দিকে ফিরিল।

পথে আসিতে আসিতে ভাবিল— যদি নারকোলটা ওদের ফেরত দিই— তাহলেও কি গাল লাগবে?

তা কেন লাগবে— যার জিনিস তাকে তো ফেরত দেওয়া হলো, তা কখনও লাগে?

বাড়িতে পা দিয়াই মেয়েকে বলিল— দুগ্‌গা, নারকোলটা সতুদের বাড়ি দিয়ে আয় গিয়ে।

অপু ও দুর্গা অবাক হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—

দুর্গা বলিল— এখ্‌খুনি?

—হ্যাঁ,—এখ্‌খুনি দিয়ে আয়। ওদের খিড়কির দোর খোলা আছে। চট করে যা। বলে আয়, আমরা কুড়িয়ে পেইছিলাম, এই নাও দিয়ে গেলাম।

—অপু আমাকে একটু দাঁড়াবে না, মা? বড্ড অন্ধকার হয়েচে, চল অপু আমার সঙ্গে।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে সর্বজয়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দিতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ঠাকুর, নারকোল ওরা শত্তুরতা করে কুড়োতে যায়নি সে তো তুমি জানো, এ গাল যেন ওদের না লাগে। দোহাই ঠাকুর, ওদের তুমি বাঁচিয়ে-বর্তে রেখো ঠাকুর। ওদের তুমি মঙ্গল কোরো। তুমি ওদের মুখের দিকে চেয়ো। দোহাই ঠাকুর।

৭

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়িতে একখানা মুদির দোকান করিতেন এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না! তবে এই বেতের উপর অভিভাবকদেরও বিশ্বাস গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা কিছু কম নয়।

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়ে রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়াছিল, মা আসিয়া ডাকিল— অপু, ওঠো শিগগির করে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে! কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট। হ্যাঁ ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্য-নিদ্রোত্থিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহার ধারণা ছিল যে যাহারা দুষ্টু ছেলে, মার কথা শোনে না, ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনোদিন ওরূপ করে না, তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে?

খানিক পরে সর্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—ওঠো অপু, মুখ ধুয়ে নাও, তোমায় অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় বসে বসে খেয়ো এখন, ওঠো লক্ষ্মী মানিক!

মায়ের কথার উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল—ইঃ! পরে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া এক প্রকার মুখভঙ্গি করিয়া রহিল, উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশি জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মার প্রতি

অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল, খাবার বাঁধিয়া দিবার সময় বলিল— আমি কখ্খনো আর বাড়ি আসচিনে দেখো!

—ষাট ষাট,বাড়ি আসবিনে কি! ওকথা বলতে নেই, ছিঃ! পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খইয়া বলিল—খুব বিদ্যে হোক, ভালো করে লেখাপড়া শিখো, তখন দেখবে তুমি কত বড়ো চাকরি করবে, কত টাকা হবে তোমার, কোনো ভয় নেই! ওগো, তুমি গুরুমশায়কে বলে দিয়ো যেন ওকে কিছু বলে না।

পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—ছুটি হবার সময়ে আমি আবার এসে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব অপু, বসে বসে লেখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি কোরো না যেন! খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অকূল সমুদ্র! সে অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড়ো বড়ো ছেলে আপন আপন চাটাই-এ বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কী পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোটো একটি ছেলে খুঁটিতে ঠেস দিয়া আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুড়িয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড়ো ছেলে তাহার গালে একটা আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কী লক্ষ করিতেছে। তাহার সামনে দুজন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কী করিতেছিল। একজন চুপিচুপি বলিতেছিল , আমি এই ঢ্যারা দিলাম, অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, এই আমার গোল্লা, সঙ্গে সঙ্গে তার শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আড়চোখে বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

অপু নিজের শ্লেটে বড়ো বড়ো করিয়া বানান লিখিতে লাগিল! কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন— এই ফনে, শ্লেটে ওসব কী হচ্ছে রে? সম্মুখের সেই ছেলে দুটি অমনি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল, কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড়ো শক্ত, তিনি বলিলেন, এই সতে ফনের শ্লেটটা নিয়ে আয় তো! তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড়ো আঁচিলওয়ালা ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

—হুঁ, এসব কী লেখা হচ্ছে শ্লেটে?— সতে ধরে নিয়ে আয় তো দুজনকে, কান ধরে নিয়ে আয়!

যেভাবে বড়ো ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল, এবং যেভাবে বিপন্নমুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড়ো হাসি পাইল, সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন, হাসে কে? হাসচো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? অ্যাঁ? এটা নাট্যশালা নাকি?

নাট্যশালা কী, অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

—সতে, একখানা থান ইট নিয়ে আয় তো তেঁতুলতলা থেকে বেশ বড়ো দেখে?

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া গেল, কিন্তু ইট আনীত হইলে সে

দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ওই ছেলে দুটির জন্য। বয়স অল্প বলিয়াই হউক বা নতুন ভরর্তি বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সে যাত্রায় তাহাকে রেহাই দিলেন।

পাঠশালা বসিত বৈকালে। সবসুদ্ধ আট-দশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ি হইতে ছোটো ছোটো মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে;অপুর মাদুর নাই, সে বাড়ি হইতে একখানা জীর্ণ কার্পেটের আসন আনে। যে ঘরটায় পাঠশালা হয়, তার কোনো দিকে বেড়া বা দেয়াল কিছু নাই; চারিদিকে খোলা, ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। আট দশটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া ও নানারূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে।

গুরুমহাশয় একটা খুঁটিতে হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাই-এর উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান-দেওয়ার অংশটি পাকিয়া গিয়াছে। বিকালবেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প-শোনা অপুর অনেক বেশি ভালো লাগিত। রাজু রায় মহাশয় প্রথম যৌবনে 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' স্মরণ করিয়া কীভাবে আষাঢ়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত। বেশ কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাঁপটা তুলিয়া বসিয়া বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয়তো মাঝে মাঝে তাদের সেই মহাভারতখানা কী বাবার সেই দাশুরায়ের পাঁচালিখানা মাটির প্রদীপের সামনে খুলিয়া বসিয়া বসিয়া পড়া! বাহিরে অন্ধকারে বর্ষারাতে টিপটিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাং ডাকিতেছে—কী সুন্দর! বড়ো হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

এই গল্পগুজব এক এক দিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিত, গ্রামের ও পাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্যাল মহাশয় যেদিন আসিতেন। যে-কোনো গল্প হউক, যত সামান্যই হউক না কেন, সেটি সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। সান্যাল মহাশয় দেশভ্রমণ-বাতিকগ্রস্ত ছিলেন। কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ তাহা আবার একা দেখিয়া তাহার তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারই স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতেন এবং খরচপত্র করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন। দিব্য আরামে নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থেলো হুঁকো টানিতেছেন, মনে হইতেছে, সান্যাল মহাশয়ের মতন নিতান্ত ঘরোয়া, সেকেলে, পাড়াগাঁয়ের প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থ বুঝি বেশি আর নাই, পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, দরজায় তালাবন্ধ, বাড়িতে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। ব্যাপ্যার কী? দেখা গেল সান্যাল মহাশয় সপরিবার বিন্ধ্যাচল, না চন্দ্রনাথ ভ্রমণে গিয়াছেন। অনেকদিন আর দেখা নাই, হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা ঠুকঠুক শব্দে লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দুই গোরুর গাড়ি বোঝাই সান্যাল মশায় সপরিবারে বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও লোকজন ডাকাইয়া হাঁটু সমান উঁচু জলবিছুটি ও অর্জুন গাছের জঙ্গল কাটিতে কাটিতে বাড়িতে ঢুকিতেছেন।

একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা পা ফেলিয়া পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন— এই যে প্রসন্ন, কীরকম আছ, বেশ জাল পেতে বসেচ যে! কটা মাছ পড়ল?

নামতা মুখস্থরত অপুর মুখ অমনি অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সান্যাল মশায় যেখানে তালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন, সেদিকে হাতখানেক জমি উৎসাহে আগাইয়া বসিত। শ্লেট বই মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিত, যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়াশোনার দরকার নাই; সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাগর ও উৎসুক চোখদুটি গল্পের প্রত্যেক কথা যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত।

কুঠির মাঠের পথে যে জায়গাটাকে এখন নাল্‌তাকুড়ির জোল বলে, ওইখানে আগে — অনেক কাল আগে গ্রামের মতি হাজরার ভাই চন্দর হাজরা কি বনের গাছ কাটিতে গিয়াছিল। বর্ষাকাল — এখানে ওখানে বৃষ্টির জলের তোড়ে মাটি খসিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ চন্দর হাজরা দেখিল এক জায়গায় যেন একটা পিতলের হাঁড়ির কানামত মাটির মধ্য হইতে একটুখানি বাহির হইয়া আছে। তখনই সে খুঁড়িয়া বাহির করিল। বাড়ি আসিয়া দেখেন — এক হাঁড়ি সেকেলে আমলের টাকা। তাই পাইয়া চন্দর হাজরা দিনকতক খুব বাবুগিরি করিয়া বেড়াইল— এসব সান্যাল মহাশয়ের নিজের চোখে দেখা।

এক একদিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রীর কীরকম কষ্ট হইয়াছিল, নাভিগয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়া পাণ্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। কোথাকার এক জায়গায় একটা খুব ভালো খাবার পাওয়া যায়, সান্যালমশায় নাম বলিলেন —প্যাঁড়া।

নামটা শুনিয়া অপুর ভারি হাসি পাইয়াছিল— বড়ো হইলে সে প্যাঁড়া কিনিয়া খাইবে।

কোন দেশে সান্যাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশ্বত্থতলায় থাকিত। এক ছিলিম গাঁজা পাইলে সে খুশি হইয়া বলিত— আচ্ছা কোন ফল তোমরা খাইতে চাও বলো। পরে ইপ্সিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের যে-কোনো একটা গাছ দেখাইয়া বলিত—যাও,ওখানে গিয়া লইয়া আইস। লোকে গিয়া দেখিত হয়তো আমগাছে বেদানা ফলিয়া আছে, কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে।

রাজু রায় বলিতেন —ওসব মন্তরতন্তরের খেলা আর কী! সে বার আমার এক মামা—

দীনু পালিত কথা চাপা দিয়ে বলিতেন — মন্তরের কথা যখন ওঠালে, তখন একটা গল্প বলি শোনো। গল্প নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলডাঙার বুধো গাড়োয়ানকে তোমরা দেখেচো কেউ? রাজু না দেখে থাকো, রাজকৃষ্ট ভায়া তো খুব দেখেচো। কাঠের দড়ি-বাঁধা এক ধরনের খড়ম পায়ে দিয়ে বুড়ো বরাবর নিতে-কামারের দোকানে লাঙলের ফাল পোড়াতে আসত। একশো বছর বয়সে মারা যায়, মারাও গিয়েছে আজ পঁচিশ বছরের ওপর। জোয়ান বয়সে আমরা তার সঙ্গে হাতের কবজির জোরে পেরে উঠতাম না।

একবার —অনেক কালের কথা— আমার তখন সবে হয়েচে উনিশ-কুড়ি বয়েস। চাকদা থেকে গঙ্গাচান করে গোরুর গাড়ি করে ফিরচি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়ি— গাড়িতে আমি আমার খুড়িমা, আর অনন্ত মুখুজ্যের ভাইপো রাম, যে আজকাল উঠে গিয়ে খুলনায় বাস করছে। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা গেল, তখন ওসব দিকে কী রকম ভয়ভীত ছিল,তা রাজকৃষ্ট ভায়া জানো নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে মেয়ে মানুষের দল, কিছু টাকাকড়িও আছে— বড্ড ভাবনা হলো। আজকাল যেখানে

নতুন গাঁ খানা বসেচে—ওই বরাবর এসে হলো কি জানো? জনাচারেক ষন্ডা মাক্কোগোছের মিশকালো লোক এসে গাড়ির পেছন দিকের বাঁশ দু-দিক থেকে ধল্লে। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমাদের মুখে রা-টা নেই, কোনোরকমে গাড়ির মধ্যে বসে আছি, এদিকে তারাও গাড়ির বাঁশ ধরে সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে। বুধো গাড়োয়ান দেখি পিট পিট করে পিছনের দিকে চাইচে। ইশারা করে আমাদের কথা বলতে বারণ করে দিল। বেশ আছে! এদিকে গাড়ি একেবারে নবাবগঞ্জ থানার কাছাকাছি এসে পড়ল। বাজার দেখা যাচ্ছে, তখন সেই লোক কজন বল্লে— ওস্তাদজি, আমাদের ঘাট হয়েচে, আমরা বুঝতে পারিনি, ছেড়ে দাও। বুধো গাড়োয়ান বল্লে— সে হবে না ব্যাটারা। আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দোব। অনেক কাকুতি-মিনুতির পর বুধো বল্লে— আচ্ছা যা, ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কক্ষনো এরকম আর করিসনি। তবে তারা বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা। মন্তরের চোটে ওই যে ওরা বাঁশ এসে ধরেচে, ধরেই রয়েচে —আর ছাড়বার সাধ্য নেই— চলেছে গাড়ির সঙ্গে। একেবারে পেরেক আঁটা হয়ে গিয়েছে। তা বুঝলে বাপু? মন্তরতন্তরের কথা—

গল্প বলিতে বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালার চারিপাশের বনজঙ্গল অপরাহ্ণের রাঙা রৌদ্র বাঁকাভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁঠালগাছের জগডুমুর গাছের ডালে ঝোলা গুলঞ্চলতার গায়ে টুনটুনি পাখি মুখ উঁচু করিয়া দোল খাইত। পাঠশালা ঘরে বনের গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই, ছেঁড়াখোড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেঝে ও কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া , সবসুদ্ধ মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

সে গ্রামের ছায়াভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাম্য বালকের ছবি আছে। বই-দপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছন পিছন সাজিমাটি দিয়া কাচা, সেলাই করা কাপড় পরিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে, তাহার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মতো নরম, চিক্কন সুখস্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে— তাহার ডাগর ডাগর সুন্দর চোখদুটিতে কেমন যেন অবাক ধরনের চাহনি—যেন তাহারা এ কোন অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালায় ঘেরা এইটুকুই কেবল তার পরিচিত দেশ — এখানেই মা রোজ হাতে করিয়া খাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়, গণ্ডিটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধারে ঘিরিয়া অপরিচয়ের অকূল জলধি! তাহার শিশুমন থই পায় না।

ওই যে বাগানের ওদিকে বাঁশবন —ওর পাশ কাটিয়া যে সরু পথটা ওধারে কোথায় চলিয়া গেল— তুমি বরাবর সোজা যদি ও পথটা বাহিয়া চলিয়া যাও, তবে শাঁখারিপুকুরের পাড়ের মধ্যে অজানা গুপ্তধনের দেশে পড়িবে —বড়ো গাছের তলায় সেখানে বৃষ্টির মধ্যে মাটি খসিয়া পড়িয়াছে— কত মোহরভরা হাঁড়ি-কলসির কানা বাহির হইয়া আছে, অন্ধকার বনঝোপের নীচে, কচু, ওল ও বন-কলমির চকচকে সবুজ পাতার আড়ালে চাপা —কেউ জানে না কোথায়।

একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা হইয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা।

সেদিন বৈকালে পাঠশালার অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় কোনো গল্পগুজব হইল না, পড়াশোনা হইতেছিল—সে গিয়া বসিয়া পড়িতেছিল শিশুবোধক—এমন সময় গুরুমহাশয় বলিলেন— শেলেট নেও, শ্রুতিলিখন লেখো—

মুখে মুখে বলিয়া গেলেও অপু বুঝিয়াছিল গুরুমহাশয় নিজের কথা বলিতেছেন না, মুখস্থ বলিতেছেন, সে যেমন দাশুরায়ের পাঁচালি ছড়া মুখস্থ বলে, তেমনি।

শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলো অমন সুন্দর কথা একসঙ্গে পর পর সে কখনও শোনে নাই। ও সকল কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না, কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝংকার-জড়ানো এক অপরিচিত শব্দসংগীত, অনভ্যস্ত শিশুকর্ণে অপূর্ব ঠেকিল এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দরুনই কুহেলি-ঘেরা অস্পষ্ট শব্দ-সমষ্টির পিছনে একটা অপূর্ব দেশের ছবি বারবার উঁকি মারিতেছিল।

বড়ো হইয়া স্কুলে পড়িবার সময় সে বাহির করিয়াছিল ছেলেবেলাকার এই মুখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে—

'এই সেই জন্মস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশপথে সততসমীর -সঞ্চরমাণ-জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত-অধিত্যকা-প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বন-পাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়.... পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া...,

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে জানে—তাহার মনে হয়, অনেক সময়ই মনে হয়—সেই যে বছর দুই আগে কুঠির মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠ পাখি দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন মাঠের ধার বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল সে। পথটার দু-ধারে যে কত কী অচেনা পাখি, অচেনা গাছপালা, অচেনা বনঝোপ,— অনেকক্ষণ সেদিন সে পথটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। মাঠের ওদিকে পথটা কোথায় যে চলিয়া গিয়েছে তাহা ভাবিয়া সে কূল পায় নাই।

তাহার বাবা বলিয়াছিল — ও সোনাডাঙা মাঠের রাস্তা, মাধবপুর-দশঘরা হয়ে সেই ধলচিতের খেয়াঘাটে গিয়ে মিশেচে!

ধলচিতের খেয়াঘাটে নয়, সে জানিত ও পথটা আরও অনেক দূরে গিয়াছে; রামায়ণ-মহাভারতের দেশে।

সেই অশথ গাছের সকলের চেয়ে উঁচু ডালটার দিকে চাহিয়া থাকিলে যাহার কথা মনে উঠে— সেই বহুদূরের দেশটা।

ওই পথের ওধারে অনেক দূরে কোথায় সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-পর্বত! বনঝোপের স্নিগ্ধ গন্ধে, না-জানার ছায়া নামিয়া আসা ঝিকিমিকি সন্ধ্যায়, সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাহাকে অবাক করিয়া দিল। কতদূরে সে প্রস্রবণ-গিরির উন্নত শিখর,আকাশপথে সতত-সঞ্চরমান মেঘমালায় যাহার প্রশান্ত, নীল সৌন্দর্য সর্বদা আবৃত থাকে?

সে বড়ো হইলে যাইয়া দেখিবে।

৮

কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাস।

অপু বৈকালবেলা বেড়াইতে যাইবার সংকল্প করিতেছে, এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল—কোথায় বেরুচ্চিস রে অপু? চাল ভাজা আর ছোলা ভাজা ভাজচি—বেরিয়ো না যেন। ...এক্ষুনি খাবি—

অপু শুনিয়াও শুনিল না—যদিও সে চাল-ছোলা ভাজা খাইতে ভালোবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্য ভাজিতে বসিয়াছে, ইহা সে জানে—তবুও সে কী করিতে পারে?— এতক্ষণ কী খেলাটাই চলিতেছে নীলুদের বাড়িতে? সে যখন বাহিরে দরজায় পা দিয়েছে, মার ডাক আবার কানে গেল—বেরুলি বুঝি!—ও অপু, বা রে দ্যাখো মজা ছেলের! গরম গরম খাবি—আমি তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে এসে ভাজতে লাগলাম —ও অপু-উ-উ—

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ি গিয়া পৌঁছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নীলু বলিল,— চল অপু দক্ষিণ মাঠে পাখির ছানা দেখতে যাবি? অপু রাজি হইলে দুজনে দক্ষিণ মাঠে গেল। ধানক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া গিয়াছে। গ্রাম হইতে এক মাইলের উপর হইবে। অপু এতদূর কখনও বেড়াইতে আসে নাই—তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গণ্ডি ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল! একটুখানি পরেই সে বলিল, বাড়ি চলো নীলুদা, আমায় মা বকবে, সন্দে হয়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারব না। তুমি বাড়ি চলো—

ফিরিতে যাইয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহাদের একটা বড়ো আমবাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে —এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুইয়ে টান দিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল— ও ভাই অপু!

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল — কীরে নীলুদা? পরে সে চাহিয়া দেখিল, যে সুঁড়ি পথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে — উঠানে একখানা ছোট্ট চালাঘর ও একটা বিলাতি আমড়ার গাছ। তাহার কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল—

আতুরি ডাইনির বাড়ি!

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল ... আতুরি ডাইনির বাড়ি। ... সন্ধ্যাবেলা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহারা! কে না জানে যে ওই উঠানের গাছে চুরি করিয়া বিলাতি আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনিরা জেলেপাড়ার কোন এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারির আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের মতো মিটিয়া যায়! কে না জানে সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোটো ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছুই জানিতে পারিবে না, কিন্তু বাড়ি গিয়া খাইয়া দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে আর পরদিন উঠিবে না! কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুরি ডাইনির গল্প শুনিতে শুনিতে সে বলিয়াছে — রাত্রিতে তুই ওসব গল্প বলিসনে দিদি, আমার ভয় করে, — তুই সেই কুঁচবরণ রাজকন্যের গল্পটা বল দিকি?

ঝাপসা দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়িতে কেহ আছে কিনা এবং চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া হিম হইয়া গেল... বেড়ায় বাঁশের আগড়ের কাছে— অন্য কেহ নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরি ডাইনি — তাহাদের— এমন কী যেন শুধু তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া! ...

যাহার জন্য এত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সামনে পিছনে কোনো দিকেই পা উঠিতে চাহিল না।

আতুরি বুড়ি ভুরু কুঁচকাইয়া, তোবড়ানো গালটা আরও ঝুলাইয়া ভালো করিয়া লক্ষ করিবার ভঙ্গিতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। অপু দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে। কোনো দিকেই আর পলাইবার পথ নাই— যে কারণেই হউক ডাইনির রাগটা তাহার উপরেই — এখনই তাহার প্রাণটি সংগ্রহ করিয়া কচুর পাতায় পুরিবে!

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে যে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার ফল এই ফলিতে চলিল! সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল — আমি কিছু জানিনে ও বুড়ি পিসি — আমি আর কিছু করব না — আমায় ছেড়ে দাও, আমি ইদিকে আর কখনও আসব না — আজ ছেড়ে দাও ও বুড়ি পিসি—

নীলু তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু অপুর এত ভয় হইয়াছিল যে চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ি বলিল — ভয় কী মোরে, ও বাবারা? মোরে ভয় কী? .... পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, মুই কি ধরে নেব খোকারা? এসো মোর বাড়িতি এসো — আমচুর দেবানি এসো —

আমচুর! ডাইনি বুড়ি ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া বাড়িতে পুরিতে চাহিতেছে — গেলেই আর কী! ... ডাইনিরা রাক্ষসীরা যে এরকম ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলে — এরকম কত গল্প তো সে মার মুখে শুনিয়াছে!

এখন সে কী করে! উপায়?

বুড়ি তাহার দিকে আরও খানিকটা আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল — ভয় কী, ও মোর বাবারা? মুই কিছু বলব না ভয় কী মোরে?

আর কী সব শেষ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিবার আর দেরি নাই, হাত বাড়াইয়া তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি কচুর পাতায় পু-রিল! সে আড়ষ্ট কণ্ঠে দিশাহারা ভাবে বলিয়া উঠিল, ও বুড়ি পিসি, আমার মা কাঁদবে, আমায় আজ আর কিছু বোলো না— আমি তোমার গাছে কোনো দিন আমড়া নিতে আসিনি—আমার মা কাঁদবে—

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে... বাড়ি, ঘরদোর, গাছপালা, নীলু, চারিধার যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। কেহ কোনোদিকে নাই...কেবল একমাত্র সে আর আতুরি ডাইনির ক্রূর দৃষ্টি মাখানো একজোড়া চোখ... আর অনেকদূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চাল ভাজা খাওয়ার ডাক!...

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরিয়া সাহস জোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব করিয়া প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া ডিঙাইয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিল — নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে।...

ইহাদের ভয়ের কারণ কী বুঝিতে না পারিয়া বুড়ি ভাবিল— মুই মাত্তিও যাইনি, ধত্তিও যাইনি—কাঁচা ছেলে, কী জানে মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা? খোকাডা কাদের?

অপু যখন বাড়ি আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্বজয়া সবে উনুন ধরাইয়া তালের বড়া ভাজিবার আয়োজন করিতেছে, দুর্গা নিকটে বসিয়া তাল চাঁচিয়া রস বাহির করিতেছে। ছেলেকে দেখিয়া বলিল—কোথায় ছিলি বল দিকি? সেই বেরিয়েচো বিকেলবেলা, কিছুই তো আজ খাবার খেলিনে— খিদে-তেষ্টা পায় না?

সে বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে, মা তাহাকে চালভাজা দেওয়ার কোনো আগ্রহই না দেখাইয়া তালের রসটা ঘন না পাতলা হইয়াছে, তাহাই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতেছে।

দুর্গা বলিল — মা শিগগির শিগগির ভেজে নাও। বড্ড মেঘ করে আসচে, বিষ্টি এলে আর ভাজা হবে না — ঘরে যে জল পড়ে! — সেদিনকার মতো হবে কিন্তু —

দেখিতে দেখিতে চারিধার ঘিরিয়া ঘনাইয়া-আসা মেঘের ছায়ায় বাঁশবনের মাথা কালো হইয়া উঠিল। খুব মেঘ জমিয়া আকাশ অন্ধকার হইয়াছে, অথচ বৃষ্টি এখনও নামে নাই — এসময় মনে এক প্রকার আনন্দ ও কৌতূহল হয় — না জানি কী ভয়ংকর বৃষ্টিই আসিতেছে, পৃথিবী বুঝি ভাসাইয়া লইয়া যাইবে —অথচ বৃষ্টি হয় প্রতিবারই, পৃথিবী কোনোবারেই ভাসায় না, তবুও এ মোহটুকু ঘোচে না! দুর্গার মন সেই অজানার আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সে মাঝে মাঝে দাওয়ার ধারে আসিয়া নীচু চালের ছাঁচ হইতে মুখ বাড়াইয়া মেঘান্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

সর্বজয়া খানকতক বড়া ভাজিয়া বলিল — এই বাটিটা করে ওকে দে তো দুগ্‌গা। — ওর খিদে পেয়েচে, বিকেল থেকে কিছু তো খায়নি! এই শেষকথাই কাল হইল — এতক্ষণ অপু যা হয় এক রকম ছিল কিন্তু মায়ের শেষের দিকের আদরের সুরে তাহার অভিমানের বাঁধ একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, সে বড়া সুদ্ধ বাটিটা উঠানে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল — আমি খাব না তো বড়া, কখ্‌খনো খাব না — যাও —

সর্বজয়া ছেলের কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। ক্ষোভে, রাগে সে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল — তোমার আজ হয়েছে কী! তোমার অদৃষ্টে আজ ছাই লেখা আছে, খেয়ো এখন তাই গরম গরম।

অপু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা মা আমি চালভাজা খাইনি তাতে আমার মনে কষ্ট হয় না? আমি বিকেল থেকে ভাবছিনে বুঝি? পরে সে রাগে আত্মহারা হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া বাহিরের উঠানের দিকে মরিয়ার মতো ছুটিল।

৯

এবার বাড়ি হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল— বাড়ি থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেরুলে দুধটা, ঘিটা—ওর শরীরটা সারবে এখন।

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনও যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোঁসাইবাগান, চালতেতলা, নদীর ধার—বড়োজোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক-এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কী জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে তাহার মা বৈকালে নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত। নদীর ওপারের খড়ের মাঠে বাবলা গাছে গাছে হলুদ রঙের ফুল ফুটিয়া থাকিত, গোরু চরিত, মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো শিমুল গাছটাকে দেখিলে মনে হইত যেন কত কালের পুরাতন গাছটা।

রাখালেরা নদীর ধারে গোরুকে জল খাওয়াইতে আসিত, ছোটো একখানা জেলে ডিঙি বাহিয়া তাহাদের গাঁয়ের অক্রুর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিতে যাইত, মাঠের মাঝে ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল বৈকালের ঝিরঝিরে বাতাসে দুলিতে থাকিত— ঠিক সেইসময় হঠাৎ একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত — সে সব প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না। শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত — দিদি দিদি দ্যাখ দ্যাখ ওইদিকে—পরে সে মাঠের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—ওই যে? ওই গাছটার পিছনে? কেমন অনেক দূর না?

দুর্গা হাসিয়া বলিত— অনেক দূর—তাই দেখাচ্ছিলি ? দূর তুই একটা পাগল!

আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই উৎসাহে তাহার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল, দিন গুনিতে গুনিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢু-দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—বাবা, যেখান দিয়ে রেল যায় সেই রেলের রাস্তা কোন দিকে!

তাহার বাবা বলিল—সামনেই পড়বে এখন, চলো না। আমরা রেললাইন পেরিয়ে যাব এখন—

সেবার তাহাদের রাঙি গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গা খুঁজিয়া দুই-তিন দিন ধরিয়া কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সে তার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল। পৌষ মাস, ক্ষেতে ক্ষেতে কলাই গাছের ফলে দানা বাঁধিয়াছে, সে ও তাহার দিদি নীচু হইয়া ক্ষেত হইতে মাঝে মাঝে কলাই ফল তুলিয়া খাইতেছিল— তাহাদের সামনে কিছু দূরে নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা, খেজুর গুড় বোঝাই গোরুর গাড়ির সারি পথ বাহিয়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিতে করিতে আষাঢুর হাটে যাইতেছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তার ওপারে বহুদূর ঝাপসা মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কী দেখিতেছিল, হঠাৎ

সে বলিয়া উঠিল, — এক কাজ করবি অপু; চল যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি?

অপু বিস্ময়ের সুরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল— রেলের রাস্তা — সে যে অনেক দূর ! সেখানে কী করে যাবি?

তাহার দিদি বলিল—বেশি দূর বুঝি! কে বলেছে তোকে—ওই পাকা রাস্তার ওপারে তো—না?

অপু বলিল— নিকটে হলে তো দেখা যাবে ? পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায় - চল দিকি দিদি, গিয়ে দেখি।

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল—বড্ড অনেক দূর, না? যাওয়া যাবে না—

—কিছু তো দেখা যায় না—অত দূরে গেলে আবার আসব কী করে? তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল, লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরিয়াভাবে বলিয়া উঠিল—চল যাই দেখে আসি অপু—কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসব এখন, হয়তো রেলের গাড়ি যাবে এখন—মাকে বলব বাছুর খুঁজতে দেরি হয়ে গেল—

প্রথমে তাহারা একটুখানি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল কেহ তাহাদিগকে লক্ষ করিতেছে কিনা। পরে পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর রোদে ভাই-বোনে মাঠ বিল জলা ভাঙিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটিল। দৌড়, দৌড়, দৌড়—নবাবগঞ্জের লাল রাস্তা ক্রমে অনেক দূর পিছাইয়া পড়িল—রোয়ার মাঠ, জলসত্রতলা, ঠাকুর-ঝি পুকুর বামধারে, ডানধারে দূরে দূরে পড়িয়া রহিল—সামনে—একটা ছোটো বিল নজরে আসিতে লাগিল। তাহার দিদি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—মা টের পেলে কিন্তু—পিঠের ছাল তুলবে। অপু একবার হাসিল—মরিয়ার হাসি। আবার দৌড়, দৌড়, দৌড়— জীবনে এই প্রথম বাধাহীন গণ্ডিহীন, মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা তরুণ রক্ত তখন মাতিয়া উঠিয়াছিল—পরে কী হইবে, তাহা ভাবিবার অবসর কোথায়?

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়। খানিক দূরে গিয়া একটা বড়ো জলা পড়িল একেবারে সামনে—হোগলা আর শোলা গাছে ভরা, তাহার উপর তাহার দিদি পথ হারাইয়া ফেলিল—কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সামনে কেবল ধানক্ষেত, জলা, আর বেত-ঝোপ। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে জলে পা পুঁতিয়া যায়, রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল—দিদির পরনের কাপড় কাঁটায় নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল, তাহার নিজের পায়ে দু -তিনবার কাঁটা টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইল— শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ি ফেরাই মুশকিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না, জল ভাঙিয়ে ধানক্ষেত পার হইয়া যখন তাহারা বহুকষ্টে আবার পাকা রাস্তায় আসিয়া উঠিল তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ি আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবেই সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে না— বকুনি খাইতে হইবে না!

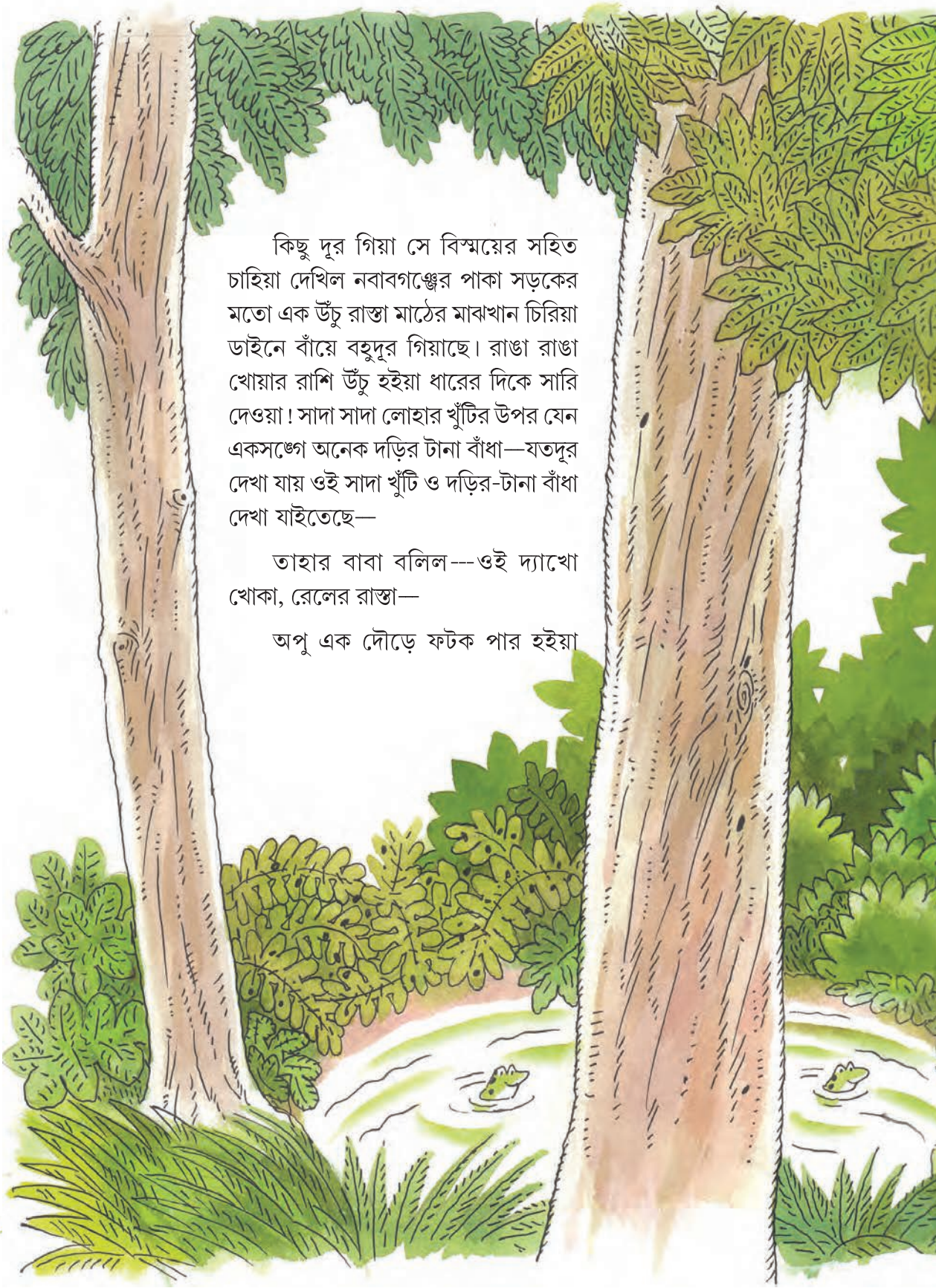

কিছু দূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মতো এক উঁচু রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া! সাদা সাদা লোহার খুঁটির উপর যেন একসঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা—যতদূর দেখা যায় ওই সাদা খুঁটি ও দড়ির-টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে—

তাহার বাবা বলিল---ওই দ্যাখো খোকা, রেলের রাস্তা—

অপু এক দৌড়ে ফটক পার হইয়া

রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুইদিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন? উহার উপর দিয়া রেলগাড়ি যায়? কেন? মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার উপর দিয়া যায় কেন? পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না? কেন? ওগুলোকে তার বলে ? তাহার মধ্যে সোঁ সোঁ কীসের শব্দ? তারে খবর যাইতেছে? কাহারা খবর দিতেছে ? কী করিয়া খবর দেয় ? ওদিকে কী ইস্টিশান ? এদিকে কী ইস্টিশান ?

সে বলিল—বাবা, রেলগাড়ি কখন আসবে? আমি রেলগাড়ি দেখব বাবা।

—রেলগাড়ি এখন কী করে দেখবে? ...সেই দুপুরের সময় রেলগাড়ি আসবে, এখনও দু-ঘণ্টা দেরি!

—তা হোক বাবা, আমি দেখে যাব, আমি কখনও দেখিনি—হ্যাঁ বাবা—

—ওরকম কোরো না, ওই জন্যে তোমায় কোথাও আনতে চাইনে—এখন কী করে দেখবে? সেই দুপুর একটা অবধি বসে থাকতে হবে তাহলে এই ঠায় রোদ্দুরে, চলো আসবার দিন দেখাব।

অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

তুমি চলিয়া যাইতেছ... তুমি কিছুই জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কী পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিককে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই! আমি যেখানে আর কখনও যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইল, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কিনা, তাহাতে আমার কী আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আজ সর্বপ্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে!

সন্ধ্যার পর তাহারা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিল। শিষ্যের নাম লক্ষ্মণ মহাজন, বেশ বড়ো চাষি ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাহিরের বড়ো আটচালা ঘরে মহা আদরে তাহারা থাকিবার স্থান করিয়া দিল।

লক্ষ্মণ মহাজনের ছোটোভাইয়ের স্ত্রী সকালে স্নান করিবার জন্য পুকুরের ঘাটে আসিয়াছিল — জলে নামিতে গিয়া পুকুরের পাড়ে নজর পড়াতে সে দেখিল পুকুরপাড়ের কলাবাগানে একটি অচেনা ছোটো ছেলে একখানি কঞ্চি হাতে কলাবাগানের একবার এদিক একবার ওদিক পায়চারি করিতেছে ও পাগলের মতো আপন মনে বকিতেছে। সে ঘড়া নামাইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল — তুমি কাদের বাড়ি এসেছ, খোকা?

অপুর যত জারিজুরি তাহার মায়ের কাছে। বাহিরে সে বেজায় মুখচোরা।

প্রথমটা অপুর মাথায় আসিল যে টানিয়া দৌড় দেয়। পরে সংকুচিত সুরে বলিল — ওই ওদের বাড়ি —

বধূটি বলিল — বটঠাকুরদের বাড়ি? বটঠাকুরের গুরুমশায়ের ছেলে? ও!

বধূ সঙ্গে করিয়া তাহাকে নিজের বাড়িতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ি পৃথক — লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ি হইতে সামান্য দূরে, কিন্তু মধ্যে পুকুরটা পড়ে।

বধূর ব্যবহারে অপুর লাজুকতা কাটিয়া গেল! সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঘরের জিনিসপত্র কৌতূহলের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ওঃ কত কী জিনিস! ... তাহাদের বাড়িতে এরকম জিনিস নাই। এরা খুব বড়োলোক তো! কড়ির আলনা, রং-বেরং-এর ঝুলন্ত শিকা, পশমের পাখি, কাচের

পুতুল, মাটির পুতুল, শোলার গাছ — আরও কত কী। — দু-একটা জিনিস সে ভয়ে ভয়ে হাতে তুলিয়া নাড়িয়া দেখিল।

বধূ এতক্ষণ ভালো করিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখে নাই — কাছের গোড়ায় দেখিয়া মনে হইল যে, এখনও ভারি ছেলেমানুষ, মুখের ভাব যেন পাঁচ বছরের ছেলের মতো কচি। এমন সুন্দর অবোধ চোখের ভাব সে আর কোনো ছেলের চোখে এপর্যন্ত দেখে নাই — এমন রং, এমন গড়ন, এমন সুন্দর মুখ, এমন তুলি দিয়া আঁকা ডাগর ডাগর নিষ্পাপ চোখ ... অচেনা ছেলেটির উপর বধূর বড়ো মমতা হইল।

অপু বসিয়া নানা গল্প করিল — বিশেষ করিয়া কল্যকার রেলপথের কথাটি। খানিকটা পরে বধূ মোহনভোগ তৈয়ারি করিয়া খাইতে দিল। একটা বাটিতে অনেকখানি মোহনভোগ, এত ঘি দেওয়া যে আঙুলে ঘিয়ে মাখামাখি হইয়া যায়। অপু একটুখানি মুখে তুলিয়া খাইয়া অবাক হইয়া গেল — এমন অপূর্ব জিনিস আর সে কখনো খায় নাই তো। — মোহনভোগে কিশমিশ দেওয়া কেন? কই তাহার মায়ের তৈরি মোহনভোগে তো কিশমিশ থাকে না? বাড়িতে সে মার কাছে আবদার ধরে — মা, আজ আমাকে মোহনভোগ করে দিতে হবে। তাহার মা হাসি-মুখে বলে — আচ্ছা ওবেলা তোকে করে দেব — পরে সে শুধু সুজি জলে সিদ্ধ করিয়া একটু গুড় মিশাইয়া পুলটিসের মতো একটা দ্রব্য তৈয়ারি করিয়া কাঁসার সর-পুরিয়া থালাতে আদর করিয়া ছেলেকে খাইতে দেয়। অপু তাহাই খুশির সহিত এতদিন খাইয়া আসিয়াছে, মোহনভাগ যে এরূপ হয় তাহা সে জানিত না। আজ কিন্তু তাহার মনে হইল এ মোহনভোগে আর মায়ের তৈয়ারি মোহনভোগে আকাশ-পাতাল তফাত! ... সঙ্গে সঙ্গে মায়ের উপর করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হয়তো তাহার মাও জানে না যে, এ রকমের মোহনভোগ হয়! — সে যেন আবছায়াভাবে বুঝিল, তাহার মা গরিব, তাহারা গরিব — তাই তাহাদের বাড়ি ভালো খাওয়াদাওয়া হয় না।

একদিন পাড়ার এক ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর বাড়ি অপুর নিমন্ত্রণ হইল। দুপুরবেলা, সে-বাড়ির একটি মেয়ে আসিয়া অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। ওদের রান্নাঘরের দাওয়ায় যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া জল ছিটাইয়া অপুকে খাবার জায়গা করিয়া দিল। যে মেয়েটি অপুকে ডাকিতে আসিয়াছিল, নাম তার অমলা, বেশ টকটকে ফর্সা রং, বড়ো বড়ো চোখ, বেশ মুখখানি, বয়স তার দিদির মতো! অমলার মা কাছে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন, নিজের হাতের তৈয়ারি চন্দ্রপুলি পাতে দিলেন। খাওয়ার পরে অমলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি দিয়া গেল। সেদিন বৈকালে খেলিতে খেলিতে অপুর পায়ের আঙুল হঠাৎ বাগানের বেড়ার দুই বাঁশের ফাঁকে পড়িয়া আটকাইয়া গেল। টাটকা চেরা নতুন বাঁশের বেড়া, আঙুল কাটিয়া রক্তারক্তি হইল, অমলা ছুটিয়া আসিয়া পা-খানা বাঁশের ফাঁক হইতে বাহির না করিলে গোটা আঙুলটাই কাটা পড়িত। সে চলিতে পারিতেছিল না, অমলা তাহাকে কোলে করিয়া গোলার পাশ হইতে পাথরকুচির পাতা তুলিয়া বাটিয়া আঙুলে বাঁধিয়া দিল। পাছে বাবার বকুনি খাইতে হয়, এই ভয়ে অপু একথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না।

পরে অপু অমলার সঙ্গে তাহাদের বাড়ি গেল। অমলা তাহাদের আলমারি খুলিয়া কাচের বড়ো মেম-পুতুল, মোমের পাখি, গাছ আরও কত কী দেখাইল। কালীগঞ্জের স্নানযাত্রার মেলা হইতে সেসব

নাকি কেনা, অপু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল। নতুন নতুন খেলার জিনিস — একটা রবারের বাঁদর, সেটা তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া চোখ পিট পিট করিবে — একটা কীসের পুতুল, সেটার পেট টিপিলে দু-হাতে মৃগী রোগীর মতো হঠাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া খঞ্জনি বাজাইতে থাকে — সকলের চেয়ে আশ্চর্যের জিনিস হইতেছে একটা টিনের ঘোড়া। রানুদির কাকা তাহাদের বাড়ির দালানের ঘড়িতে যেমন দম দেয়, ওইরকম দম দিয়া ছাড়িয়া দিলে খড়খড় করিয়া মেঝের ওপর চলিতে থাকে — অনেক দূর যায় — ঠিক যেন একেবারে সত্যিকারের ঘোড়া। সেইটা দেখিয়া অপু অবাক হইয়া গেল। হাতে তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত উলটাইয়া দেখিয়া অমলার দিকে চাহিয়া বলিল — এ কী রকম ঘোড়া, বেশ তো! এ কোথা থেকে কেনা, এর দাম কত?

তাহার পর অমলা তাহাকে একটা সিঁদুরের কৌটা খুলিয়া দেখাইল — সেটার মধ্যে রাঙা রং-এর একখানা ছোটো রাংতার মতো কী? অপু বলিল — ওটা কী? রাংতা?

অমলা হাসিয়া বলিল — রাংতা হবে কেন? — সোনার পাত দেখনি অপু? অপু সোনার পাথ দেখে নাই। সোনার রং কি অত রাঙা? সোনার পাতখানা নাড়িয়া চাড়িয়া ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল। অমলার সহিত বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে সে ভাবিল — আহা, দিদিটার ওসব খেলনা কিছুই নেই — মরে কেবল শুকনো নাটাফল আর রড়ার বিচি কুড়িয়ে আর শুধু পরের পুতুল চুরি করে মার খায়! ... তাহার পয়সা থাকিলে সে দিদিকে একটা কলের ঘোড়া কিনিয়া দিত — আর একটা রবারের বাঁদর ... তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া সেটা চোখ পিটপিট করে ...

বধূর কাছে একজোড়া পুরোনো তাস ছিল; ঠিক একজোড়া বলা চলে না, সেটা নানা জোড়া তাসের পরিত্যক্ত কাগজগুলি এক জায়গায় জড়ো করা আছে মাত্র — অপু সেগুলি লইয়া মধ্যে মধ্যে নাড়ে চাড়ে। রানুদির বাড়িতে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা তাসের আড্ডা বসিত, সে বসিয়া বসিয়া খেলা দেখিত। টেক্কা, গোলাম, সাহেব, বিবি — কাগজ ধরা লইয়া মারামারি হয় — বেশ খেলা! সে তাস খেলিতে জানে না, তাহার মা দিদি কেহই জানে না। এক একদিন তাহার মা তাস খেলিতে যায়, তাহার মাকে লইয়া কেহ বসিতে চায় না, সকলে বলে, ও কিছু খেলা জানে না।

সে যদি এক জোড়া তাস পায় তবে সে, মা ও দিদি খেলে। খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরবেলা তাদের বাড়ির বনের ধারের দিকে সেই জানালাটা... যেটার কবাটগুলোর মধ্যে কী পোকায় কাটিয়া সরিষার মতো গুঁড়া করিয়া দিয়াছে... নাড়া দিলে ঝুরঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়ে, পুরানো কাঠের গুঁড়ার গন্ধ বার হয় — জানালার ধারের বন থেকে দুপুরের হাওয়ায় গন্ধভেদালি লতার কটু গন্ধ আসে, রোয়াকের কালমেঘের গাছের জঙ্গলের দিদির পরিচিত কাঁচপোকাটা একবার ওড়ে, আবার বসে, আবার ওড়ে, আবার বসে — নির্জন দুপুরে তারা তিনজনে সেই জানালাটির ধারে মাদুর পাতিয়া বসিয়া আপন মনে তাস খেলিবে।

সন্ধ্যার পর বধূর ঘরে অপুর নিমন্ত্রণ ছিল। খাইতে বসিয়া খাবার জিনিসপত্র ও আয়োজনের ঘটা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ছোটো একখানা ফুলকাটা রেকাবিতে আলাদা করিয়া নুন ও নেবু কেন? নুন নেবু তো মা পাতেই দেয়! প্রত্যেক তরকারির জন্যে আবার আলাদা বাটি! — তরকারিই বা কত! অতবড়ো গলদা চিংড়ির মাথাটা কি তাহার একার জন্য?

লুচি! লুচি! তাহার ও তাহার দিদির স্বপ্নকামনার পারে এক রূপকথার দেশের নীল-বেলা আবছায়া দেখা যায় ... কত রাতে, দিনে, ওলের ডাঁটাচচ্চড়ি ও লাউ ছেঁচকি দিয়া ভাত খাইতে খাইতে, কত জল-খাবার-খাওয়া-শূন্য সকালে বিকালে, অন্যমনস্ক মন হঠাৎ লুব্ধ, উদাস গতিতে ছুটিয়া চলে সেখানে — যেখানে গরম রোদে দুপুরবেলা তাহাদের পাড়ার পাকা রাধুঁনি বীরু রায় গামছা কাঁধে ঘুরিয়া বেড়ায়, সদ্য তৈয়ারি বড়ো উনুনের উপর বড়ো লোহার কড়াই-এ ঘি চাপানো থাকে, লুচি-ভাজার অপূর্ব সুধারুচি-ঘ্রাণ আসে, কত ছেলেমেয়ে ভালো কাপড়জামা পরিয়া যাতায়াত করে, গাঙ্গুলি বাড়ির বড়ো নাটমন্দির ও জলপাইতলা বিছাইয়া গ্রীষ্মের দিনে সতরঞ্চ পাতা হয়, একদিন মাত্র বছরে সে দেশের ঠিকানা খুঁজিয়া মেলে — সেই চৈত্র বৈশাখ মাসে রামনবমী দোলের দিনটা — তাহাদের সেদিন নিমন্ত্রণ থাকে ওপাড়ার গাঙ্গুলি বাড়ি। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সে সুদিনের উদয় হইল কী করিয়া! খাইতে বসিয়া বারবার তাহার মনে হইতেছিল, আহা, তাহার দিদি এরকম খাইতে পায় নাই কখনও!

১০

দিন দুই পরে হরিহর ছেলেকে লইয়া বাড়ি আসিল।

এই মোটে কয়দিন, এরই মধ্যে সর্বজয়া ছেলেকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছে না।

দুর্গার খেলা কয়দিন হইতে ভালোরকম জমে নাই, অপুর বিদেশ যাত্রার দিনকতক আগে দেশি-কুমড়ার শুকনো খোলার নৌকা লইয়া ঝগড়া হওয়াতে দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল — এখন আরও অনেক কুমড়ার খোলা জমিয়াছে, দুর্গা কিন্তু আর সেগুলি জলে ভাসাইতে যায় না — কেন মিছিমিছি এনিয়ে ঝগড়া করে তার কান মলে দিলাম? আসুক সে ফিরে, আর কক্ষনো তার সঙ্গে ঝগড়া নয়, সব খোলা সে-ই নিয়ে নিক।

বাড়ি আসিয়া অপু দিন পনেরো ধরিয়া নিজের অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনি বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত আশ্চর্য জিনিস সে দেখিয়াছে এই কয়দিনে! রেলের রাস্তা, যেখান দিয়া সত্যিকারের রেলগাড়ি যায়! মাটির আতা, পেঁপে, শশা— অবিকল যেন সত্যিকার ফল! সেই পুতুলটা, যেটার পেট টিপিলে মৃগী রোগীর মতো হাত-পা ছুঁড়িয়া হঠাৎ খঞ্জনি বাজাইতে শুরু করে!

কতদূর যে সে গিয়াছিল, কত পদ্মফুলে ভরা বিল কত অচেনা নতুন গাঁ পাড় হইয়া কত মাঠের উপরকার নির্জন পথ বাহিয়া, সেই যে কোন গাঁয়ের পথের ধারে কামার-দোকানে বাবা তাহাকে জল খাওয়াইতে লইয়া গেলে, তাহারা তাহাকে বাড়ির মধ্যে ডাকিয়া লইয়া যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া দুধ, চিঁড়ে, বাতাসা খাইতে দিয়াছিল! কোন্‌টা ফেলিয়া সে কোন্‌টা গল্প করে!

রেলরাস্তার গল্প শুনিয়া তাহার দিদি মুগ্ধ হইয়া যায়, বারবার জিজ্ঞাসা করে —কত বড়ো নোয়াগুনো দেখলি অপু? তার টাঙানো বুঝি ? খুব লম্বা? রেলগাড়ি দেখতে পেলি? গেল?

না — রেলগাড়ি অপু দেখে নাই। ওইটাই কেবল বাদ পড়িয়াছে — সে শুধু বাবার দোষে। মোটে ঘণ্টা চার-পাঁচ রেলরাস্তার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই রেলগাড়ি দেখা যাইত — কিন্তু বাবাকে সে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বেলা হইয়া যাওয়াতে ব্যস্ত অবস্থায় সর্বজয়া তাড়াতাড়ি অন্যমনস্কভাবে সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া উঠানে পা দিতেই কী যেন একটা সরু দড়ির মতো বুকে আটকাইল ও সঙ্গে সঙ্গে কী যেন একটা পটাং করিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার শব্দ হইল এবং দু-দিক হইতে দুটা কী, উঠানে ঢিলা হইয়া পড়িলা গেল। সমস্ত কার্যটি চক্ষের নিমেষে হইয়া গেল, কিছু ভালো করিয়া দেখিবার কী বুঝিবার পূর্বেই।

অল্পখানিক পরেই অপু বাড়ি আসিল। দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল — নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না — এ কী! বা রে, আমার টেলিগিরাপের তার ছিঁড়লে কে?

ক্ষতির আকস্মিকতায় ও বিপুলতায় প্রথমটা সে কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। পরে একটু সামলাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখিল উঠানের মাটিতে ভিজা পায়ের দাগ এখনও মিলায় নাই। তাহার মনের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল — মা ছাড়া আর কেউ নয়। কখ্খনো আর কেউ নয়, ঠিক মা। বাড়ি ঢুকিয়া সে দেখিল মা বসিয়া বসিয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে কাঁঠাল-বিচি ধুইতেছে। সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল এবং যাত্রাদলের অভিমন্যুর মতো ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বাঁশির সপ্তমের মতো রিনরিনে তীব্র মিষ্টি সুরে কহিল — আচ্ছা মা, আমি কষ্ট করে ছোটাগুলো বুঝি বন-বাগান ঘেঁটে নিয়ে আসিনি?

সর্বজয়া পিছনে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিল কী নিয়ে এসেচিস? কী হয়েছে?

—আমার বুঝি কষ্ট হয় না? কাঁটায় আমার হাত-পা ছড়ে যায়নি বুঝি?

—কী বলে পাগলের মতো? হয়েচে কী?

—কী হয়েচে! আমি এত কষ্ট করে টেলিগিরাপের তার টাঙালাম, তার ছিঁড়ে দেওয়া হয়েচে, না?

—তুমি যত উদঘুট্টি কাণ্ড ছাড়া তো এক দণ্ড থাকো না বাপু! পথের মাঝখানে কী টাঙানো রয়েছে — কী জানি টেলিগিরাপ কি কি-গিরাপ, আসচি তাড়াতাড়ি, ছিঁড়ে গেল তখন কী করব বলো —

পরে সে পুনরায় নিজ কাজে মন দিল।

উঃ! কী ভীষণ হৃদয়হীনতা ! আগে আগে সে ভাবিত বটে যে, তাহার মা তাহাকে ভালোবাসে — অবশ্য যদিও তাহার সে ভ্রান্ত ধারণা অনেকদিন ঘুচিয়া গিয়াছে —তবুও মাকে একটা নিষ্ঠুর পাষাণীরূপে কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কাল সারাদিন কোথায় নীলমণি জ্যাঠার ভিটা, কোথায় পালিতদের বড়ো আমবাগান, কোথায় প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের বাঁশবন — ভয়ানক ভয়ানক জঙ্গলে একা ঘুরিয়া বহু কষ্টে উঁচু ডাল হইতে দোলানো গুলঞ্চলতা কত কষ্টে জোগাড় করিয়া সে আনিল, এখুনি রেল-রেল খেলা হইবে সব ঠিকঠাক, আর কি না...

হঠাৎ সে মাকে একটা খুব কড়া, খুব রূঢ়, খুব একটা প্রাণ-বিঁধানো কথা বলিতে চাহিল — এবং খানিকটা দাঁড়াইয়া বোধহয় অন্য কিছু ভাবিয়া না পাইয়া আগের চেয়েও তীব্র নিখাদে বলিল আমি আজ

ভাত খাব না যাও — কখ্খনো খাব না—

তাহার মা বলিল — না খাবি না খাবি যা — ভাত খেয়ে একেবারে রাজা করে দেবেন কিনা? এদিকে তো রান্না নামাতে তর সয় না — না খাবি যা, দেখব খিদে পেলে কে খেতে দ্যায়?

ব্যাস! চক্ষের পলকে — সব আছে, আমি আছি তুমি আছ — সেই তাহার মা কাঁঠাল-বিচি ধুইতেছে— কিন্তু অপু কোথায়? সে যেন কর্পূরের মতো উবিয়া গেল! কেবল ঠিক সেইসময়ে দুর্গা বাড়ি ঢুকিতে দরজার কাছে তাহাকে পাশ কাটাইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিতসুরে ডাকিয়া বলিল—ও অপু, কোথায় যাচ্ছিস অমন করে, কী হয়েচে, ও অপু শোন—

তাহার মা বলিল, — জানিনে আমি, যত সব অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড বাপু তোমাদের, হাড়মাস কালি হয়ে

গেল— কী এক পথের মাঝখানে টাঙিয়ে রেখেচে, আসছি, ছিঁড়ে গেল তা — এখন কী হবে? আমি কি ইচ্ছে করে ছিঁড়িছি? তাই ছেলের রাগ — আমি ভাত খাব না — না খাস যা, ভাত খেয়ে সব একেবারে স্বগ্‌গে ঘণ্টা দেবে কিনা তোমরা?

মাতাপুত্রের এরূপ অভিমানের পালায় দুর্গাকেই মধ্যস্থ হইতে হয়— সে অনেক ডাকাডাকির পরে বেলা দুইটার সময় ভাইকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সে শুষ্কমুখে উদাস-নয়নে ও পাড়ার পথে রায়েদের বাগানে পড়ন্ত আমগাছের গুঁড়ির উপর বসিয়াছিল।

বৈকালে যদি কেহ অপুদের বাড়ি আসিয়া তাহাকে দেখিত তবে সে কখনোই মনে করিতে পারিত না যে, এ সেই অপু — যে আজ সকালে মায়ের উপর অভিমান করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিল। অপু বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, কিছুই বাকি নাই, ঠিক যেন একেবারে সত্যিকার রেলরাস্তার তার।

সে সতুদের বাড়ি গিয়া বলিল— সতুদা, আমি টেলিগিরাপের তার টাঙিয়ে রেখেছি আমাদের বাড়ির উঠোনে, চলো রেল রেল খেলা করি— আসবে?

— তার কে টাঙিয়ে দিলেরে?

— আমি নিজে টাঙালাম। দিদি ছোটা এনে দিয়েছিল—

সতু বলিল— তুই খেলগে যা, আমি এখন যেতে পারব না-অপু মনে মনে বুঝিল বড়ো ছেলেদের ডাকিয়া দল বাঁধিয়া খেলার জোগাড় করা তাহার কর্ম নয়। কে তাহার কথা শুনিবে? তবুও আর একবার সে সতুর কাছে গেল। নিরাশ মুখে রোয়াকের কোণটা ধরিয়া নিরুৎসাহভাবে বলিল — চলো না সতুদা, যাবে? তুমি আমি দিদি খেলব এখন? পরে সে প্রলোভনজনক ভাবে বলিল— আমি টিকিটের জন্য এতগুলো বাতাবি নেবুর পাতা তুলে এনে রেখেচি। সে হাত ফাঁক করিয়া পরিমাণ দেখাইল। —যাবে?

সতু আসিতে চাহিল না। অপু বাহিরে বড়ো মুখ-চোরা, সে আর কিছু না বলিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেল। দুঃখে তার চোখে প্রায় জল আসিতেছিল— এত করিয়া বলিতেও সতুদা শুনিল না!

পরদিন সকালে সে ও তাহার দিদি দুজনে মিলিয়া ইট দিয়া একটা বড়ো দোকানঘর বাঁধিয়া জিনিসপত্রের জোগাড়ে বাহির হইল। দুর্গা বনজঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যের সন্ধান বেশি রাখে— দুজনে মিলিয়া নোনাপাতার পান, মেটে-আলু, ফলের আলু, রাধালতা ফুলের মাছ, তেলাকুচার পটল, চিচ্চিড়ের বরবটি, মাটির ঢেলার সৈন্ধব লবণ— আরও কত কী সংগ্রহ করিয়া আসিয়া দোকান সাজাইতে বড়ো বেলা করিয়া ফেলিল। অপু বলিল —চিনি কীসে করবি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—বাঁশতলার পথে সেই ঢিবিটায় ভালো বালি আছে—মা চালভাজা ভাজবার জন্যে আনে! সেই বালি চল্ আনি গে— সাদা চক্‌চক্‌ কচ্ছে — ঠিক একেবারে চিনি—

বাঁশবনে চিনি খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা পথের ধারের বনের মধ্যে ঢুকিল। খুব উঁচু একটা বন চটকা গাছের আগডালে একটা বড়ো লতার ঘন সবুজ আড়ালে, টুকটুকে রাঙা, বড়ো বড়ো সুগোল কী ফল দুলিতেছে! অপু ও দুর্গা দুজনেই দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অনেক চেষ্টায় গোটা কয়েক ফলসুদ্ধ

নীচের দিকে লতার খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া তলায় পড়িতেই মহা আনন্দে দুজনে একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া সেগুলিকে মাটি হইতে তুলিয়া লইল।

পাকা ফল মোটে তিনটি। প্রধানত বিপণি-সজ্জার উদ্দেশ্যেই তাহা দোকানে এরূপভাবে রক্ষিত হইল যে খরিদ্দার আসিলে প্রথমেই যেন নজরে পড়ে। পুরাদমে বেচাকেনা আরম্ভ হইয়া গেল। দুর্গা নিজেই পান কিনিয়া পান প্রায় ফুরাইয়া ফেলিল। খেলা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় সদর দরজা দিয়া সতুকে ঢুকিতে দেখিয়া অপু মহা আনন্দে তাহাকে আগাইয়া আনিতে দৌড়িইয়া গেল — ও সতুদা, দ্যাখো না কীরকম দোকান হয়েচে, কেমন ফল দ্যাখো? আমি আর দিদি পেড়ে আনলাম— কী ফল বলো দিকি? জানো?

সতু বলিল — ও তো মাকাল ফল— আমাদের বাগানে ক-ত ছিল!

সতু আসিতে অপু যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সতুদা তাহাদের বাড়িতে তো বড়ো একটা আসে না— তাছাড়া সতুদা ছেলেদের দলের চাঁই। সে আসাতে খেলার ছেলেমানুষিটুকু যেন ঘুচিয়া গেল!

অনেকক্ষণ পুরা মরশুমে খেলা চলিবার পর দুর্গা বলিল— ভাই আমাকে দু-মন চাল দাও, খুব সরু, কাল আমার পুতুলের বিয়ের পাকা দেখা, অনেক লোক খাবে—

সতু বলিল—আমাদের বুঝি নেমন্তন্ন, না?

দুর্গা মাথা দুলাইয়া বলিল— তা বইকি? তোমরা তো হলে কনেযাত্রী—কাল সকালে এসে নকুতো করে নিয়ে যাব—সতুদা রানুকে বলবে আজ রাত্তিরে যেন একটু চন্দন বেটে রাখে? কাল সকালে নিয়ে আসব—

দুর্গার কথা ভালো করিয়া শেষ হয় নাই এমন সময় সতু দোকানে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত পণ্যের মধ্য হইতে কী-একটা তুলিয়া লইয়া হঠাৎ দৌড় দিয়া দরজার দিকে ছুটিল— সঙ্গে সঙ্গে অপুও, ওরে দিদি রে— নিয়ে গেল রে — বলিয়া তাহার রিনরিনে তীব্র মিষ্ট গলায় চিৎকার করিতে করিতে তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল!

বিস্মিত দুর্গা ভালো করিয়া ব্যাপারটা কী বুঝিবার আগেই সতু ও অপু দৌড়াইয়া দরজার বাহির হইয়া চলিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে খেলাঘরের দিকে চোখ পড়িতেই দুর্গা দেখিল সেই পাকা মাকাল ফল তিনটির একটিও নাই!...

দুর্গা একছুটে দরজার কাছে আসিয়া দেখিল সতু গাবতলার পথে আগে আগে ও অপু তাহা হইতে অল্প নিকটে পিছু পিছু ছুটিতেছে। সতুর বয়স অপুর চেয়ে তিন চারি বৎসরের বেশি, তাহা ছাড়া সে অপুর মতো ওরকম ছিপছিপে মেয়েলি গড়নের ছেলে নয়— বেশ জোরালো হাত-পা-ওয়ালা ও শক্ত — তাহার সহিত ছুটিয়া অপুর পারিবার কথা নয় — তবুও যে সে ধরি-ধরি করিয়া তুলিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, সতু ছুটিতেছে পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া এবং অপু ছুটিতেছে প্রাণের দায়ে।

হঠাৎ দুর্গা দেখিল যে সতু ছুটিতে ছুটিতে পথে একবারটি যেন নীচু হইয়া পিছনে ফিরিয়া চাহিল — সঙ্গে সঙ্গে অপুও হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল—সতু ততক্ষণে ছুটিয়া দৃষ্টির বাহির হইয়া চালতেতলার পথে গিয়া পড়িয়াছে।

দুর্গা ততক্ষণে দৌড়িয়া গিয়া অপুর কাছে পৌঁছিল। অপু একদম চোখ বুজিয়া একটু সামনের দিকে নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইতেছে — দুর্গা বলিল— কী হয়েচে রে অপু?

অপু ভালো করিয়া চোখ না চাহিয়াই যন্ত্রণার সুরে দু-হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, — সতুদা চোখে ধুলো ছুড়ে মেরেচে— দিদি—চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি নারে—

দুর্গা তাড়াতাড়ি অপুর হাত নামাইয়া বলিল— সর সর দেখি — ওরকম করে চোখ রগড়াসনে, দেখি?

অপু তখনি দু-হাত আবার চোখে উঠাইয়া আকুল সুরে বলিল—উহুঁ ও দিদি— চোখের মধ্যে কেমন হচ্ছে — আমার চোখ কানা হয়ে গিয়েছে দিদি—

—দেখি দেখি ওরকম করে চোখে হাত দিসনে —সর — পরে সে কাপড়ের ফুঁপাড়িয়া চোখে ভাপ দিতে লাগিল। কিছু পরে অপু একটু চোখ মেলিয়া চাহিতে লাগিল— দুর্গা তাহার চোখের পাতা তুলিয়া অনেকবার ফুঁ দিয়া বলিল— এখন বেশ দেখতে পাচ্ছিস? — আচ্ছা তুই বাড়ি যা... আমি ওদের বাড়ি গিয়ে ওর মাকে আর ঠাক্‌মাকে সব বলে দিয়ে আসচি— রানুকেও বলব — আচ্ছা দুষ্টু ছেলে তো — তুই যা আমি আসছি এখ্‌খুনি—

রানুদের খিড়কি দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া দুর্গা কিন্তু যাইতে সাহস করিল না। সেজোঠাকরুনকে সে ভয় করে। খানিকক্ষণ খিড়কির কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিয়া সে বাড়ি ফিরিল। সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া সে দেখিল অপু দরজার বাম ধারের কবাটখানি সামনে ঠেলিয়া দিয়া তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। সে ছিঁচকাদুনে ছেলে নয়, বড়ো কিছুতেই সে কখনও কাঁদে না — রাগ করে বটে, অভিমান করে বটে, কিন্তু কাঁদে না। দুর্গা বুঝিল আজ তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে, অতি সাধের ফলগুলি গেল... তাহা ছাড়া আবার চোখে ধুলা দিয়া এরূপ অপমান করিল! অপুর কান্না যে সে সহ্য করিতে পারে না— তাহার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে।

সে গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল—সান্ত্বনার সুরে বলিল কাঁদিসনে অপু, আয় তোকে আমার সেই কড়িগুলো সব দিচ্চি—আয় — চোখে কি আর ব্যথা বাড়চে?... দেখি, কাপড়খানা বুঝি ছিঁড়ে ফেলেচিস?

১১

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা অপু কোথাও বাহির না হইয়া ঘরে থাকে। অনেকদিনের জীর্ণ পুরাতন কোঠা-বাড়ির পুরাতন ঘর। জিনিসপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কটা রং-এর সেকালের বেতের প্যাঁটরা কড়ির আলনা জলচৌকিতে ঘর ভরানো। এমন সব বাক্স আছে যাহা অপু কখনও খুলিতে দেখে নাই, তাহাতে রক্ষিত সব হাঁড়ি কলসি আছে, যাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সবসুদ্ধ মিলিয়া ঘরটিতে পুরানো জিনিসের কেমন একটি পুরোনো পুরোনো গন্ধ বাহির হয় —সেটা কীসের গন্ধ সে জানে না, কিন্তু সেটা যেন বহু অতীত কালের কথা মনে আনিয়া দেয়। সে অতীত দিনে অপু ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আলনা ছিল, ওই ঠাকুরদাদার বেতের ঝাঁপিটি ছিল, ওই বড়ো কাঠের সিন্দুকটা ছিল, ওই যে সোঁদালি গাছের মাথা বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে, ওই পোড়ো জঙ্গলে-ভরা জায়গাটাতে কাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, আরও কত নামের কত ছেলেমেয়ে এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তারা ছায়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, কতকাল আগে!

যখন একা ঘরে থাকে, মা ঘাটে যায়— তখন তাহার অত্যন্ত লোভ হয় ওই বাক্সটা বেতের ঝাঁপিটা খুলিয়া দিনের আলোয় বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে কী অদ্ভুত রহস্য উহাদের মধ্যে গুপ্ত আছে। ঘরের আড়ার সর্বোচ্চ তাকে কাঠের বড়ো বারকোসে যে তালপাতার পুঁথির স্তূপ ও খাতাপত্র আছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল সেগুলি তাহার ঠাকুরদাদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কারের— তাহার বড়ো ইচ্ছা ওইগুলি যদি হাতের নাগালে ধরা দেয়, তবে সে একবার নীচে নামাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। এক একদিন বনের ধারে জানালাটায় বসিয়া দুপুরবেলা সে সেই ছেঁড়া কাশীদাসের মহাভারতখানা লইয়া পড়ে, সে নিজেই খুব ভালো পড়িতে শিখিয়াছে, আগেকার মতো আর মুখে শুনিতে হয় না, নিজেই জলের মতো পড়িয়া যায় ও বুঝিতে পারে। পড়াশুনায় তাহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ম, তাহার বাবা মাঝে মাঝে তাহাকে গাঙ্গুলিবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের মজলিশে লইয়া যায়, রামায়ণ কী পাঁচালি পড়িতে দিয়া বলে, পড়ো তো বাবা, এঁদের একবার শুনিয়ে দাও তো। বৃদ্ধেরা খুব তারিফ করেন,পুত্রগর্বে হরিহরের বুক ভরিয়া যায়।

তাহাদের ঘরের জানালার কয়েক হাত দূরেই বাড়ির পাঁচিলের ওপাশ হইতেই পাঁচিলের গা ঘেঁষিয়া কী বিশাল আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে! জানালায় বসিয়া শুধু চোখে পড়ে সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ভাঁট-শ্যাওড়া গাছের মাথাগুলো, এগাছে এগাছে দোদুল্যমান কত রকমের লতা, প্রাচীন বাঁশঝাড়ের শীর্ষ বয়সের ভারে যেখানে সোঁদালি, বন-চালতা গাছের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার নীচের কালো মাটির বুকে খঞ্জন পাখির নাচ!

তাহাদের বাড়ির ধার হইতে এ বনজঙ্গল একদিকে সেই কুঠির মাঠ, অপর দিকে নদীর ধার পর্যন্ত একটানা চলিয়াছে। অপুর কাছে এ বন অফুরন্ত ঠেকে, সে দিদির সঙ্গে কতদূর এ বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের শেষ দেখিতে পায় নাই — শুধু এইরকম তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়া পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো থোলো থোলো বনচালতার ফল চারিধারে। সুঁড়ি পথটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এ গাছের ও গাছের তলা দিয়া বন-কলমি,নাটা-কাঁটা, ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় সেই ত্রিশূন্যে দোলে, প্রাচীন শিরীষ গাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার ঝাড় নজরে আনে!

এই বন তার শ্যামলতার নবীন স্পর্শটুকু তার আর তার দিদির মনে বুলাইয়া দিয়াছিল। জন্মিয়া অবধি এই বন তাহাদের সুপরিচিত, প্রতি পলের প্রতি মূহুর্তের নীরব আনন্দে তাহাদের পিপাসুহৃদয় কত বিচিত্র কত অপূর্ব রসে ভরিয়া তোলে।

এই বনের মধ্যে কোথায় একটি মজা পুরানো পুকুর আছে, তারই পাড়ে যে ভাঙা মন্দিরটা আছে, আজকাল যেমন পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোনো সময় ওই মন্দিরের বিশালাক্ষীদেবী সেইরকম ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা, এক সময়ে কী বিষয়ে সফল মনস্কাম হইয়া তাঁহারা দেবীর মন্দিরে নরবলি দেন, তাহাতে রুষ্টা হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আর কখনও ফিরিবেন না। অনেক কালের কথা, বিশালাক্ষী পূজা হইতে দেখিয়াছে এরূপ কোনো লোক আর জীবিত নাই, মন্দির ভাঙিয়া-চুরিয়া গিয়াছে, মন্দিরের সম্মুখের পুকুর মজিয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে, চারিধার বনে ছাইয়া ফেলিয়াছে; মজুমদার বংশে বাতি দিতে আর কেহ নাই।

কেবল—সেও অনেকদিন আগে — গ্রামের স্বরূপ চক্রবর্তী ভিন-গাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন—সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে নামিয়া আসিতে পথের ধারে দেখিলেন একটি সুন্দরী ষোড়শী মেয়ে দাঁড়াইয়া। স্থানটি লোকালয় হইতে দূরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পথে কেহ কোথাও নাই, এ সময় নিরালা বনের ধারে একটি

অল্পবয়সি সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া স্বরূপ চক্রবর্তী দস্তুরমতো বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা কহিবার পূর্বেই মেয়েটি ঈষৎ গর্বমিশ্রিত অথচ মিষ্টসুরে বলিল— আমি এ গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী। গ্রামে অল্পদিনে ওলাওঠার মড়ক আরম্ভ হবে —বলে দিয়ো চতুর্দশীর রাত্রে পঞ্চানন্দতলায় একশো আটটা কুমড়ো বলি দিয়ে যেন কালীপুজো করে। কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভিত স্বরূপ চক্রবর্তীর চোখের সামনে মেয়েটি চারিধারের শীত-সন্ধ্যায় কুয়াশায় ধীরে ধীরে যেন মিলাইয়া গেল। এই ঘটনার দিন-কয়েক পরে সত্যই সেবার গ্রামে ভয়ানক মড়ক দেখা দিয়াছিল।

এসব গল্প কতবার শুনিয়াছে। জানালার ধারে দাঁড়াইলেই বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা তাহার মনে ওঠে। দেবী বিশালাক্ষীকে একটিবার দেখতে পাওয়া যায় না? হঠাৎ সে বনের পথে হয়তো গুলঞ্চের লতা পাড়িতেছে — সেইসময়—

খুব সুন্দর দেখিতে, রাঙা-পাড় শাড়ি পরনে,
হাতে-গলায় মা-দুর্গার মতো হার, বালা।

—তুমি কে!

—আমি অপু।

—তুমি বড়ো ভালো ছেলে, কী বর চাও?

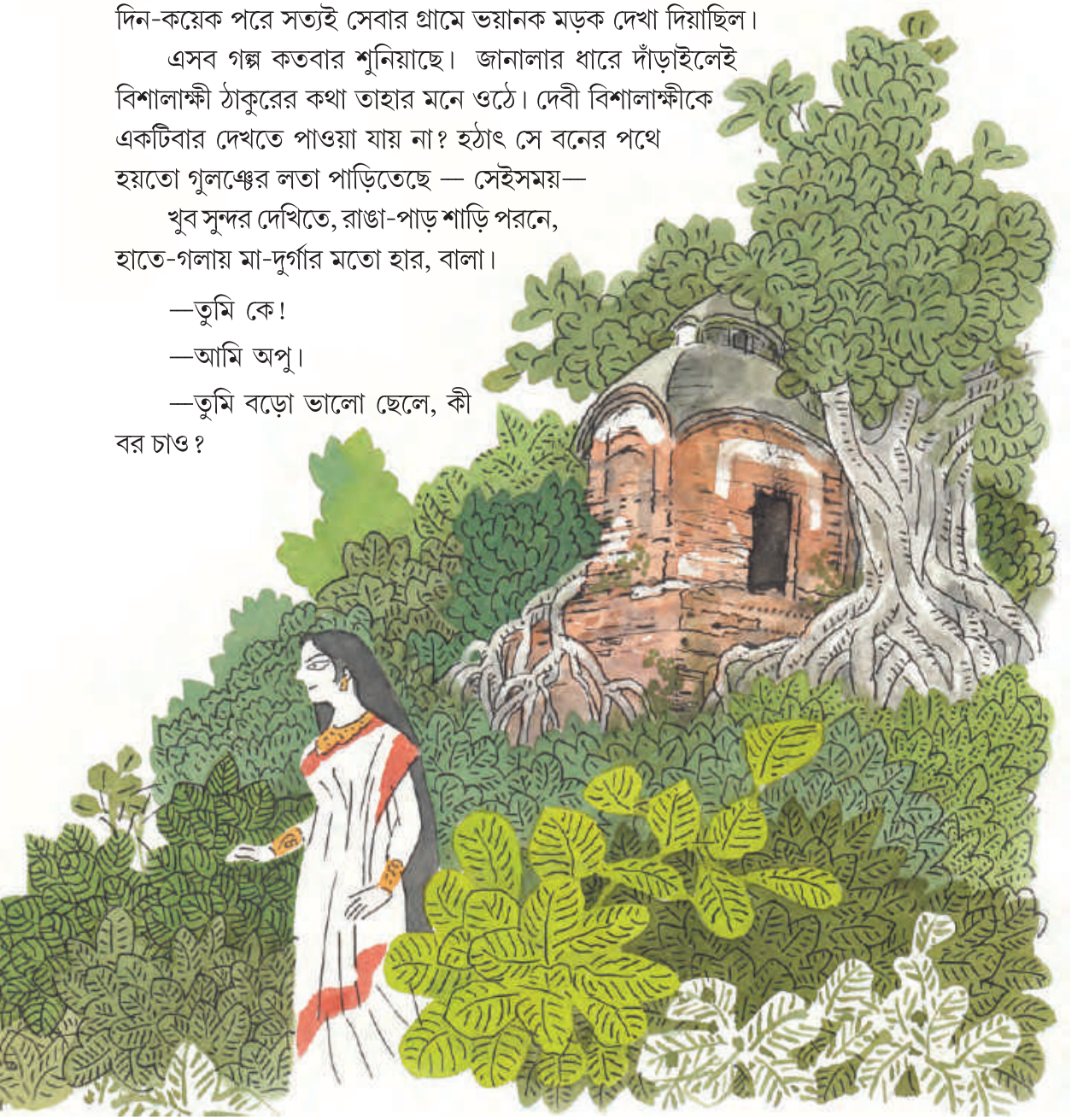

সে বিছানায় গিয়া শোয়। এক একবার ঝিরঝিরে হাওয়ায় কত কী লতাপাতার তিক্তমধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে, ঠিক দুপুরবেলা অনেক দূরের কোনো বড়ো গাছের মাথার উপর হইতে গাঙচিল টানিয়া টানিয়া ডাকে, যেন এই ছোট্ট গ্রামখানির অতীত ও বর্তমান সমস্ত ছোটো-খাটো দুঃখ শান্তি-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে, শরৎ-মধ্যাহ্নের রৌদ্রভরা, নীল-নির্জন আকাশপথে, এক উদাস, গৃহ-বিবাগী পথিক দেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না, ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে বেলা একেবারে নাই। জানালার বাহিরে সারা বনটায় ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, বাঁশঝাড়ের আগায় রাঙা রোদ।

প্রতিদিন এই সময়ে — ঠিক এই ছায়া-ভরা বৈকালটিতে নির্জন বনের দিকে চাহিয়া তাহার অতি অদ্ভুত কথা সব মনে হয়! অপূর্ব খুশিতে মন ভরিয়া ওঠে, মনে হয় এরকম লতাপাতার মধুর গন্ধভরা দিনগুলি ইহার আগে কবে একবার যেন আসিয়াছিল, সেসব দিনের অনুভূত আনন্দের অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া এই দিনগুলিকে ভবিষ্যতের কোনো অনির্দিষ্ট আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে। মনে হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বুঝি বৃথা যাইবে না — একটা বড়ো কোনো আনন্দ ইহাদের শেষে অপেক্ষা করিয়া আছে যেন!

অপূর্ব, অদ্ভুত বৈকালটা... নিবিড় ছায়াভরা গাছপালার ধারে খেলাঘর... গুলঞ্চলতার তার টাঙানো খেজুর ডালের ঝাঁপ... বনের দিক হইতে ঠান্ডা ঠান্ডা গন্ধ বাহির হয়... রাঙা রোদটুকু জ্যেঠামহাশয়দের পোড়ো ভিটায় বাতাবিলেবুর গাছের মাথায় চিকচিক করে... চকচকে বাদামি রং-এর ডানাওয়ালা তেড়ো পাখি বনকলমি ঝোপে উড়িয়া আসিয়া বসে... তাজা মাটির গন্ধ... ছেলেমানুষের জগৎ — ভরপুর আনন্দে উছলিয়া ওঠে, কাহাকে সে কী করিয়া বুঝাইবে সে কী আনন্দ!

১২

সন্ধ্যার পর সর্বজয়া ভাত চড়াইয়াছিল! অপু দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছে। খুব অন্ধকার, একটানা ঝিঁঝিপোকা ডাকিতেছে।

অপু জিজ্ঞাসা করিল— পুজোর আর কদিন আছে, মা?

দুর্গা বঁটি পাতিয়া তরকারি কাটিতেছিল। বলিল, — আর বাইশ দিন আছে, না মা?

সে হিসাব ঠিক করিয়াছে। তাহার বাবা বাড়ি আসিবে, অপুর, মায়ের, তাহার জন্য পুতুল, কাপড়, আলতা। দুর্গার মন আজ খুব খুশি আছে। রাত্রিতে রান্না প্রায়ই হয় না, ওবেলার বাসি ভাত তরকারি